শ্রীশ্রী শোভাম

প্রকাশক ঃ

শ্রীপূর্ণচন্দ্র রায়

সন্তদাস-বীথি, সন্তনগর

বারাণসী

ঃ তৃতীয় সংস্করণ ঃ

রথযাত্রা

১৩৭২ বাংলা

মুদ্রাকর ঃ

শ্রীমৃণালকান্তি চৌধুরী

বঙ্গ ভারতী প্রিণ্টার্স

৬৮-এ, সীতারাম ঘোষ ষ্ট্রীট,

কলিকাতা-৯

ওঁ

ক্ষিত্যাদিষু প্রকটিতাষ্টতনুঃ পুন র্য
স্তন্বষ্টকং সুশুচি সদ্‌গুরুনাম চান্যৎ।
জগ্রাহ তং পতিততারণমাত্র-কামং
পাশাষ্টকোপহত ঈশমহং স্মরামি॥

ক্ষিতি প্রভৃতি (অর্থাৎ ক্ষিতি, জল, বহ্নি, বায়ু, আকাশ, সূর্য্য, চন্দ্র ও যজ্ঞে দীক্ষিত দ্বিজ—এই) অষ্ট তনুতে আপনাকে প্রকটিত করিয়া পতিত জনগণকে উদ্ধার করিতে হইবে এই এক-মাত্র কামনাবশে যিনি পুনরায় সদ্‌গুরুনামক মললেশশূন্য পৃথক্ অষ্ট তনু ধারণ করিয়া আছেন, অষ্টপাশে উপহত আমি সেই পরমেশ্বরকে স্মরণ করিতেছি।

I do not forgive in my friends the failure to know a fine character and to entertain it with thankful hospitality. When at last that which we have always longed for is arrived, and shines on us with glad rays out of that far celestial land, then to be coarse, then to be critical and treat such a visitant with the jabber and suspicion of the street, argues a vulgarity that seems to shut the doors of heaven.

This is confusion, this is right insanity, when the soul no longer knows its own, nor where its allegiance, its religion are due.

Emerson.

মুখবন্ধ

সত্যদ্রষ্টা কবি গাহিয়াছেন, "তোমার কর্ম্ম তুমি কর মা, লোকে বলে করি আমি।" আমি সেই মহাবাক্যের প্রতিধ্বনি করিয়া এই পুস্তকপ্রণয়নসম্বন্ধে সরলবিশ্বাসেই বলিতেছি সর্ব্বকর্ম্মাধীশ্বরী জগন্মাতা আমাকে দিয়া এই কাজটি করাইয়া নিয়াছেন। একথা যদি সত্য হয় যে, বাস্তবিক আমরা কিছু করি না, তিনিই সব করান, তাহা হইলে তিনি কেন সর্ব্বপ্রকারে অযোগ্য জানিয়াও আমাকে এই কর্ম্মে প্রবৃত্ত করাইলেন, সে প্রশ্নের উত্তর আমার দেয় নয়। ইহার গুণাগুণের জন্য তিনিই দায়ী।

কিন্তু মানুষের কর্তৃত্বাভিমান দুর্নিবার; সেই অভিমান হইতে আমি সর্ব্বাগ্রে ইহার সকল ফলাফল তাঁহারই চরণে অর্পণ করিলাম।

এই গ্রন্থে আমার জ্ঞান ও বিশ্বাস-মতে সত্যভিন্ন মিথ্যার স্থান দেওয়া হয় নাই। যাহা আমার সাক্ষাৎ জ্ঞানের বাহিরে, এরূপ কিছু লিপিবদ্ধ করিতে সর্ব্বত্রই মূলের উল্লেখ করা হইয়াছে। অতিরঞ্জন ও ভাবরঞ্জিত নেত্রে দর্শন অনেক সময়ে সত্যকেও মিথ্যায় পরিণত করে। অতিরঞ্জনের প্রবৃত্তি বর্ত্তমানক্ষেত্রে আমাতে নিতান্তই অনুপপন্ন; কেননা আমি অন্য সদ্‌গুরুর আশ্রিত, শোভা মায়ের শিষ্য নহি; এমন কি সে সম্প্রদায়েরও

কেহ নহি। শোভা মায়ের বা তদীয় গুরুদেব শ্রীশ্রীসন্তদাস বাবাজীর মহাত্ম্যপ্রচারে আমার সাক্ষাত বা পরোক্ষ কোনও স্বার্থ নাই। আর ভাবপ্রবণতার খ্যাতি বা অখ্যাতি দূরাতীত বাল্যকাল হইতে উপস্থিত বার্দ্ধক্যপর্য্যন্ত কোনও দিন কেহ আমাকে দেয় নাই।

পুস্তকের পরিচয় পাঠক পুস্তকেই পাইবেন; মুখবন্ধে পুনরুক্তি নিষ্প্রয়োজন। সহৃদয় ব্যক্তিমাত্রকেই ইহা ধৈর্য্যসহকারে, এবং সম্ভব হইলে যাঁহাদের মহিমা ইহাতে কীর্ত্তিত হইয়াছে তাঁহাদের প্রতি সমুচিত সদ্ধাসহকারে, পাঠ করিতে সবিনয়ে আহ্বান করি। যদি কেহ কোনও কারণে পূর্ব্ব হইতে বিরুদ্ধভাবাপন্ন থাকেন, তাঁহাকেও ইহা তৎকালের জন্য সংস্কার-বর্জ্জিত হইয়া পাঠ করিতে অনুরোধ করি। অবশ্য রচনার সমস্ত দোষের জন্য আমিই দায়ী। ঘটনাসমূহের দায়িত্ব তাঁহার যিনি অঘটন ঘটাইতে সুপটু, যাঁহার মহিমায় "সূর্য্যাচন্দ্রমসৌ বিধৃতৌ তিষ্ঠতঃ"—সূর্য্য ও চন্দ্র (শূন্য আকাশে) বিধৃত রহিয়াছেন।

শোভা মায়ের জীবনেতিহাসের সীমা প্রতিদিনই প্রসারিত হইতেছে এবং শতবর্ষ পর্য্যন্ত হউক ইহাই কামনা করি। বর্ত্তমান কালে সেই ইতিহাস লিখিতে হইলে কোনও একটি স্থানে দাঁড়ি অর্থাৎ পূর্ণবিরামচিহ্ন অবশ্যই দিয়া লইতে হইবে। এই পুস্তকের কলেবর ও সাধারণ প্রয়োজন ইত্যাদির প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া আমি বাঙ্গালা ১৩৪৫ সালের অন্তে দাঁড়ি টানিয়া

দিয়াছি। কেবল উপসংহারে যে সকল চিঠির কোনও কোনও অংশ উদ্ধৃত হইয়াছে, উহাদের কয়েকটি ঐ সময়ের পরে প্রাপ্ত।

শোভা মায়ের পিতা শ্রীযুক্ত সুকুমারবাবু এই পুস্তকখানির পাণ্ডুলিপি স্বয়ং পাঠ করিয়াছেন এবং শোভা মাকেও পড়িয়া শুনাইয়াছেন। উভয়েই স্থলে স্থলে কিছু কিছু সংশোধনাদিও করিয়াছেন। তদ্ভিন্ন সুকুমারবাবু এই পুস্তকরচনায় মৎ-কর্ত্তৃক তাঁহার ডায়েরীর ব্যবহার সানন্দে অনুমোদন করিয়াছেন। এই সকল অনুগ্রহের জন্য আমি তাঁহার নিকট বিশেষভাবেই কৃতজ্ঞ। মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত গোপীনাথ কবিরাজও এই পুস্তকের পাণ্ডুলিপি আদ্যন্ত পাঠ করিয়া দুই একটি ভ্রমসংশোধনে সহায়তা করিয়াছেন। পুস্তকখানি সর্ব্বাংশে তাঁহার অনুমোদন লাভ করিয়াছে বলিয়া আমি অত্যন্ত আনন্দিত হইয়াছি এবং নিঃশঙ্কচিত্তে ইহা সত্যপ্রিয় সুধীগণের হস্তে দিতেছি।

ডক্টর শ্রীমান্ সুরেশচন্দ্র দেব এই গ্রন্থ প্রকাশিত হইতে বহুপ্রকারে সাহায্য করিয়াছেন। তিনি আমার পরমার্থ-ভ্রাতা আবার শোভা মাতেও ভক্তিমান্। তাঁহার এই সাহায্য আমি শ্রীশ্রীগুরুদেবের শ্রীচরণে কৃতজ্ঞতাসহকারে নিবেদন করিলাম।

কলিকাতা, ২৮শে শ্রাবণ, ১৩৪৮	সজ্জনের কৃপাপ্রার্থী শ্রীঅক্ষয়কুমার দত্তগুপ্ত

দ্বিতীয় সংস্করণের বিজ্ঞপ্তি

এই পুস্তকখানি প্রচারিত হইবার পর অনেক ধর্ম্মজিজ্ঞাসু ব্যক্তি ইহা পাঠ করিয়া তৃপ্তি লাভ করিয়াছেন এবং অনেকে মায়ের চরণও আশ্রয় করিয়া আপনাদিগকে ধন্য মনে করিতেছেন। আরও অনেকে ইহা ক্রয় করিবার উদ্দেশ্যে আমাকে পত্র লিখিতেছেন। প্রথমবারে যতগুলি পুস্তক মুদ্রিত হইয়াছিল তৎসমুদয়ই নিঃশেষ হওয়ায় এই শেষোক্ত ব্যক্তিবর্গের নিকট আমাকে কিছুদিন যাবৎ লজ্জা পাইতে হইতেছে। সৌভাগ্যক্রমে মায়ের ভক্তিমান্ ও উদ্যমশীল সন্তান শ্রীযুক্ত রুক্মিণীবল্লভ সেন এই পুস্তক দ্বিতীয়বার মুদ্রণের সম্পূর্ণভার বহন করিতে প্রস্তুত হওয়ায় আমি সানন্দে তাঁহাকে দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশ করিতে দিলাম। এই সংস্করণ মুদ্রণ ও প্রচলন জন্য আর্থিক বা অন্যবিধ দায় বা দাবী আমার কিছুই রহিল না। প্রথমবারে পুস্তকে স্থলে স্থলে সামান্য যে দুই একটি ভ্রম প্রবেশ করিয়াছিল, এইবারে তৎসমুদয় সংশোধন এবং একটি নূতন বৃত্তান্ত যোগ করিয়া দিলাম। একটি পরিশিষ্টও সংযুক্ত হইল। শ্রীশ্রীমায়ের লীলা জয়যুক্ত হউক। আমার নিতান্ত অযোগ্যতাসত্ত্বেও মায়েরই কৃপায় এই লীলায় আমি যে সূচ্যগ্র পরিমিত স্থান প্রাপ্ত হইয়াছি তদ্দ্বারা আমি গৌরবান্বিতই হইয়াছি। ইতি

"কৃপাকুঞ্জ"
৬২ নং লেক এভিনিউ
কলিকাতা-২৬
১৪ই ফাল্গুন, ১৩৫৮

শ্রীঅক্ষয়কুমার দত্তগুপ্ত

ওঁমা

প্রকাশকের নিবেদন

পরম শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার দত্তগুপ্ত মহাশয়ের লিখিত 'বালিকা ব্রহ্মজ্ঞা—শ্রীশ্রীশোভা মা' গ্রন্থের ইহা তৃতীয় সংস্করণ। সাধুসঙ্গের মাহাত্ম্য সর্বশাস্ত্রেই কীর্ত্তিত হইয়াছে। সাধুসঙ্গের অভাবে সাধুর জীবনীপাঠও সাধুসঙ্গই। শ্রুতি বলেন :—

যস্য দেবে পরা ভক্তির্যথা দেবে তথা গুরৌ।
তস্যৈতে কথিতা হ্যর্থাঃ প্রকাশন্তে মহাত্মনঃ॥ শ্বেঃ উঃ

স্মৃতিতেও উক্ত আছে :—তদ্বিদ্ধি প্রণিপাতেন পরিপ্রশ্নেন সেবয়া।
উপদেক্ষ্যন্তি তে জ্ঞানং জ্ঞানিনস্তত্ত্বদর্শিনঃ ॥ গীতা ॥

পুরাণ শ্রেষ্ঠ শ্রীমদ্ভাগবত বলেন :—তস্মাদ্‌গুরুং প্রপদ্যেত
জিজ্ঞাসুঃ শ্রেয় উত্তমম্।
শাব্দে পরে চ নিষ্ণাতং ব্রহ্মণ্যুপশমাশ্রয়ম্॥

জ্ঞানীশ্রেষ্ঠ আচার্য্য শঙ্করের উক্তি—ক্ষণমিহ সজ্জনসঙ্গতিরেকা
ভবতি ভবার্ণবতরণে নৌকা॥

শ্রীমন্মহাপ্রভুও বলিয়াছেন—সাধুসঙ্গ সাধুসঙ্গ সর্ব্বশাস্ত্রে কয়।
লবমাত্র সাধুসঙ্গ সর্ব্বসিদ্ধি হয়॥ চৈঃ চঃ

শ্রুতি, স্মৃতি, পুরাণ এবং সজ্জনের বাক্য হইতে ইহাই প্রমাণিত হয় না কি যে দুর্লভ মনুষ্য জন্মে সাধু সন্তের জীবনীর পঠন-পাঠন অপরিহার্য্য? প্রতিসংস্করণেই গ্রন্থের পরিমার্জ্জন, পরিবর্ত্তন ও পরিবর্দ্ধন হওয়া স্বাভাবিক। এক্ষেত্রেও তাহাই হইয়াছে। গ্রন্থশেষে "শ্রীশ্রীমায়ের লীলাখেলা" অধ্যায়টি যুক্ত হওয়ায় গ্রন্থের অভিনবত্ব যে বৃদ্ধি পাইয়াছে তাহা বলাই বাহুল্য।

যে সকল গ্রন্থের পঠন-পাঠন দুর্লভ মনুষ্য জন্মে অপরিহার্য্য তাহারই অন্যতম শ্রীশ্রীমায়ের এই জীবনী গ্রন্থের তৃতীয় সংস্করণ প্রকাশের সৌভাগ্য প্রাপ্তহইয়া আমি নিজেকে ধন্য মনে করিতেছি।

রথযাত্রা
১৩৭২ বাংলা

কৃপাপ্রার্থী
শ্রীপূর্ণচন্দ্র রায়



समाधिस्था मा

শ্রীশ্রীশোভা মা

এক

শ্রীশ্রীশোভা মায়ের সহিত আমার পরিচয় হয় ইংরাজী ১৯৩৮ সনের ডিসেম্বরের শেষ দিকে। তৎপূর্ব্বে আমার পরম-প্রীতিভাজন বন্ধু ও গুরুভ্রাতা কাশীর গভর্ণমেণ্ট সংস্কৃত কলেজের অবসরপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ (প্রিন্সিপাল) মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত শ্রীযুক্ত গোপীনাথ কবিরাজ, এম. এ. এবং অন্যান্য দু'একটি লোক হইতে তাঁহার নাম ও আধ্যাত্মিক ক্ষেত্রে অসাধারণ উন্নত অবস্থার কথা কিছু কিছু শুনিয়াছিলাম। ১৯৩৮ সনেরই এপ্রিল মাসে মহামহোপাধ্যায় গোপীনাথ পূর্ণকুম্ভস্নান উপলক্ষ্যে হরিদ্বার গিয়াছিলেন। ঢাকার শ্রীশ্রীআনন্দময়ী মাও তখন তথায় তাঁহার ভক্ত অবসরপ্রাপ্ত সিভিল সার্জ্জন ডাঃ পন্থের "পীতকুঠী" নামক বাটীতে অবস্থিতি করিতেছিলেন। ঐ সময়ে শোভা মায়ের জেঠতাত ভাই শ্রীযুক্ত শিশিরকুমার রাহা* আনন্দময়ী মায়ের কাছে সর্ব্বদা আসিতেন এবং শোভা মায়ের অনেক কথা ও মত তাঁহাকে এবং অন্যান্য জিজ্ঞাসু লোকদিগকে বলিতেন। ইঁহার মুখেই শ্রীযুক্ত গোপীনাথ শোভা মায়ের কথা প্রথম শুনিতে

---

* বর্ত্তমানে "সুদর্শন"-নামক ধর্ম্মবিষয়ক ত্রৈমাসিক পত্রের সম্পাদক ব্রহ্মচারী শিশিরকুমার।

পান। শিশিরবাবু ব্রজবিদেহী শ্রীশ্রী৺সন্তদাস বাবাজীর শিষ্য। তিনি দীক্ষার পর হইতে গুরুর সঙ্গেই থাকিতেন এবং গুরুর ইহলোক হইতে তিরোধানের পর প্রথমে শিবপুরস্থ নিম্বার্কাশ্রমে এবং পরে গুরুর বৃন্দাবনস্থিত আশ্রমে থাকিয়া সাধনভজনাদি করিতেন। হরিদ্বারে পূর্ণকুম্ভমেলার কিঞ্চিদধিক দুই বৎসর পূর্ব্বে শোভা মায়ের পিতা শ্রীযুক্ত বাবু সুকুমার রাহা (বি. এ., বি. টি.) মহাশয়ের এক পত্রে হঠাৎ মায়ের একটা অবস্থার বিবরণ পাইয়া এবং সেটা বাস্তবিক কোনও আধ্যাত্মিক অবস্থা বা ব্যাধিবিশেষ তাহা পর্য্যবেক্ষণ ও পরীক্ষা করিয়া দেখিবার জন্য সুকুমারবাবু কর্ত্তৃক অনুরুদ্ধ হইয়া শিশির-বাবু সুকুমারবাবুর কর্ম্মস্থল ত্রিপুরা-জিলাস্থ বরকান্তা নামক গ্রামে চলিয়া যান।* সেখানে পর্য্যবেক্ষণ ও পরীক্ষা করিতে করিতে কিছু দিন মধ্যেই তাঁহার মনে এই প্রতীতি জন্মে যে, শ্রীশ্রীশোভা মা ৺সন্তদাস বাবাজীর অলৌকিক কৃপাবলে আধ্যাত্মিক উন্নতির পথে দ্রুত অগ্রসর হইতেছেন। শিশিরবাবু যাহা দেখিতেন এবং শুনিতেন তৎসমুদয় ডায়েরীতে লিখিয়া রাখিতেন। হরিদ্বারে অবস্থানকালে এই ডায়েরী তাঁহার সাথেই ছিল। মহামহোপাধ্যায় গোপীনাথের অনুরোধে তিনি তাঁহাকে ঐ ডায়েরী দেখিতে দেন। মহামহোপাধ্যায় অধ্যাত্মশাস্ত্রে পরম-পণ্ডিত, এমন কি বর্ত্তমানে ভারতবর্ষে অদ্বিতীয় পণ্ডিত বলিলেও

* শ্রীযুক্ত সুকুমারবাবু বরকান্তা সরকারী সাহায্যপ্রাপ্ত উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক ছিলেন। ১৩৪৯ সালে তিনি বৈকুণ্ঠধাম প্রাপ্ত হইয়াছেন।

অত্যুক্তি হয় না। তিনি শিশিরবাবুর ডায়েরী পাঠ করিয়া খুবই বিস্মিত হন এবং তখনই সঙ্কল্প করেন কাশী হইতে সুদূর হইলেও তিনি বরকান্তা যাইয়া স্বচক্ষে শ্রীশ্রীশোভা মাকে একবার দেখিয়া আসিবেন।

সাধুগণের সহিত আলাপ ও তাঁহাদের সাধনরহস্য এবং সাধনলব্ধ অভিজ্ঞতা-সম্বন্ধে অনুসন্ধান করিবার প্রবৃত্তি গোপীনাথের চিরদিনই খুব প্রবল। এ বিষয়ে তাঁহার মনে বিন্দুমাত্রও সাম্প্রদায়িক সঙ্কীর্ণতা বা ব্যক্তিগত অহঙ্কার অভিমান নাই। মহাপুরুষ বলিয়া প্রচারিত কোনও ব্যক্তি কাশীতে গেলে সংবাদ পাওয়ামাত্র গোপীনাথ তাঁহার সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন এবং যত-দিন পর্য্যন্ত তাঁহার সাধনাদি-সম্বন্ধে জ্ঞাতব্য তথ্য অবগত না হন, ততদিন অবসর পাইলেই তাঁহার সহিত আলাপ-আলোচনা করিতে থাকেন। এবারে তিনি শোভা মা সম্বন্ধে এতদূর কৌতূহ-লাক্রান্ত হইয়াছিলেন যে, তিনি বরকান্তা পর্য্যন্ত ধাবন করিয়া তাঁহার সহিত আলাপ করিতে উৎসুক হইয়া উঠেন এবং মাস দুই পরেই পুরীর পথে কলিকাতায় আসিয়া শিশিরবাবুর বন্ধু ও গুরুভ্রাতা বাবু দেবহরি দে (বি. এস্-সি.)-কে সঙ্গী পাইয়া বরকান্তা গমন করেন। দেবহরিবাবুর সহিত গোপীনাথের পরিচয় হরিদ্বারেই হয়। বরকান্তা-যাত্রাকালে কলিকাতা হইতে আরও দুইটি লোক গোপীনাথের সহযাত্রী হন; এক—ডক্টর সুরেশচন্দ্র দেব (ডি. এস্-সি.), দুই—শ্রীযুক্ত জিতেশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী। সুরেশচন্দ্র শ্রীযুক্ত গোপীনাথের (সুতরাং আমারও)

গুরুভ্রাতা, অপেক্ষাকৃত অল্পবয়স্ক যুবক এবং জড়বিজ্ঞানে কৃতবিদ্য হইয়াও ধর্ম্মানুরাগী। জিতেশ আমার কুলপুরোহিত-পুত্র, পটারি (pottery) নির্ম্মাণবিদ্যায় দক্ষতালাভ করিয়া আসানসোলের নিকট নির্শাচট্টি গ্রামে একটি কারখানা স্থাপন করিয়া তাহার পরিচালনা করিতেছিলেন। ধর্ম্মে তৎপূর্বে তাঁহার বিশেষ অনুরাগের কথা শুনি নাই। সুরেশ কৌতূহলী হইয়াই গোপীনাথের সঙ্গী হইয়াছিলেন; জিতেশ তাঁহার কারখানার শেয়ার বিক্রয়ের উদ্দেশ্যে কুমিল্লা, শ্রীহট্ট-প্রভৃতি স্থানে গমন করিবার জন্যে পূর্ব্বেই ইচ্ছুক ছিলেন, এখন গোপীনাথের সঙ্গ পাইয়া রথ দেখা ও কলা বেচা দুই কাজই একযাত্রায় হাসিল করিবার সুযোগ দেখিলেন।

এ পর্য্যন্ত আমি শোভা মায়ের নামও শুনি নাই। শ্রীযুক্ত গোপীনাথ কলিকাতা হইয়া বরকান্তা গেলেও, তৎপূর্বে আমার সহিত সাক্ষাৎ করেন নাই। তিনি চলিয়া যাওয়ার পরে আমি অন্য এক ব্যক্তি হইতে এই সংবাদ পাই। গোপীনাথ বরকান্তায় কয়েক দিন থাকিয়া তথা হইতে কলিকাতায় ফিরিয়া পুরীধামে চলিয়া যান এবং তথায় কিছু দিন অবস্থান করেন। এবারেও আমার সহিত তিনি সাক্ষাৎ করেন নাই। ইহার কিছু দিন পরে আমার স্বগ্রামবাসী এবং সহোদর-তুল্য স্নেহভাজন শ্রীমান্ মতিলাল বণিক্ (উপাধি—দত্ত) একদিন বেঙ্গল লাইব্রেরীতে আমার সহিত দেখা করিতে আসে। মতি তখন কলিকাতার এক জাপানী সদাগরী আফিসের দালাল। আমি

জানিতাম সে কুলগুরু হইতে গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্ম্মে দীক্ষাপ্রাপ্তির পর সুপ্রসিদ্ধ বৈষ্ণব পণ্ডিত ৺রসিকমোহন বিদ্যাভূষণ হইতে উপদেশাদি গ্রহণ করিয়া কিছু কিছু সাধনাদি করে এবং মোটের উপর বেশ ধর্ম্মানুরাগী। এদিকে গোপীনাথের সহিতও তাহার আবাল্য প্রণয় আছে।

মতি আসিয়া শ্রীশ্রীশোভা মায়ের বিবরণ সে যতটুকু শুনিয়াছিল তাহা আমাকে বলে, এবং ইহাও বলে যে, জিতেশ বরকান্তাতে শোভা মায়ের নিকট দীক্ষাগ্রহণ করিয়া ওখান হইতে (বোধ করি অন্যান্য স্থল হইয়া) হবিগঞ্জে মতির জ্যেষ্ঠা কন্যার গৃহে অতিথি হইয়াছিলেন। মতি বলে, তাহার কন্যা হবিগঞ্জ হইতে তাহাকে এই মর্মে পত্র লিখিয়াছে, "জিতেশ কাকা যেন কেমন-কেমন হইয়া গিয়াছেন, চুল ছোট করিয়া ফেলিয়াছেন, টিকি রাখিয়াছেন, এবং গলায় তুলসীর মালা ধারণ করিয়াছেন" ইত্যাদি। জিতেশ ইতঃপূর্ব্বে হ্যাট্-কোট্ পরিতেন, এবং আচার-আচরণে সাহেব না হইলেও কণ্ঠিধারণের মত রুচি তাহাতে পূর্বে দেখা যায় নাই। জিতেশ জাতিতে ব্রাহ্মণ এবং আজন্ম শাক্ত আবেষ্টনে বর্দ্ধিত ; পৌরোহিত্য তাহাদের পৈত্রিক ব্যবসায়, সুতরাং জাত্যভিমানও তাহাতে কিঞ্চিত থাকিবার কথা। তা ছাড়া তাহার প্রকৃতি ধীর, হুজুক প্রিয়তা তাহাতে কখনও কেহ লক্ষ্য করি নাই। এহেন জিতেশ চক্রবর্ত্তী বরকান্তা গিয়াই একজন কায়স্থ বালিকা (শুনিয়াছিলাম শোভা মায়ের বয়স তখন ষোল-সতের বৎসর মাত্র)

হইতে শুধু দীক্ষাই গ্রহণ করিল না, চুল কাটিল, টিকি রাখিল, তুলসীর কণ্ঠি গলায় চড়াইল, এবং কেমন কেমনও হইয়া গেল ;—এ কি ? অবশ্যই বালিকা শোভার মধ্যে এমন কিছু আছে যাহা সহজেই এই অঘটন ঘটাইতে পারিয়াছে।

ইহার পরে—বোধ করি আগষ্ট মাসে (১৯৩৮)—শ্রীযুক্ত গোপীনাথ পুরী হইতে কলিকাতায় ফিরিয়া আমার সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। তিনি বলিলেন, তিনি শোভার যে অবস্থা দেখিয়াছেন তাহা পূর্ণ ব্রহ্মজ্ঞানের অবস্থা। তাঁহাকে তিনি আধ্যাত্মিক প্রসঙ্গে অনেক প্রশ্ন করিয়াছেন এবং তৎক্ষণাৎ তৎসমুদয়ের অতি স্পষ্ট ও প্রবোধজনক উত্তর পাইয়াছেন। পুরী হইতেও তিনি পত্রযোগে বহু প্রশ্ন করিয়া সদুত্তর পাইয়াছেন। আমাকে দেখাইবার জন্য গোপীনাথ শোভা মায়ের লেখা বিভিন্ন পত্রে যে সমস্ত প্রশ্ন করিয়াছিলেন সে সবই সাধন-রাজ্যের নানা-সূক্ষ্মরহস্য-সম্বন্ধে। অল্প সময়ের আলাপে শোভা-কথিত যে সকল রহস্যের পূর্ণ মর্ম্ম ধরা যায় নাই, তিনি সেই সকল বিশদ করিয়া লইবার উদ্দেশ্যেই পত্রের পর পত্র লিখিয়া-ছিলেন। কি আলাপের সময়, কি পত্রোত্তরে তিনি যে সকল উত্তর পাইয়াছিলেন, তাহা যৎসামান্যশিক্ষাপ্রাপ্তা কোনও গ্রাম্য-বালিকার পক্ষে দেওয়া ত সম্ভবই নহে, সে সকলই তাঁহার হাই স্কুলের হেডমাষ্টার পিতারও জ্ঞান ও ধারণার বহু দূরের বস্তু। ঐ সব উত্তর কেহ তাঁহাকে কোনও গ্রন্থ হইতে মুখস্থ করাইয়া রাখিয়াছে বা পত্র লিখিবার সময় বলিয়া দিয়াছে,

ইহাও অসম্ভব। কেননা তাঁহার সব কথাই অতি গভীর ও প্রত্যক্ষ জ্ঞানের পরিচায়ক ছিল; কোনটাই ঠিক কেতাবী কথা নয়।

গোপীনাথ শোভা মায়ের সঙ্গে আলাপ করিয়া যে সকল রহস্য অবগত হইয়াছিলেন, তাহারও কতক কতক আমাকে বলিলেন। সে সমস্তই আমার কাছে এতই নূতন যে, আমি একখানি খাতায় তাহার কিছু কিছু নোট করিয়া রাখিলাম পরে যথাস্থানে উল্লেখ করিতে হইবে বলিয়া এখানে আর তৎসমুদয়ের আলোচনার প্রয়োজন বোধ করি না।

ইহার পরে কয়েক মাস পরে আর শোভা মা সম্বন্ধে নূতন কোনও সংবাদ পাই নাই; গোপীনাথ হইতেও কোন পত্রাদি পাই নাই। পৌষ মাসে বড়দিনের ছুটিতে হঠাৎ একদিন একখানি পত্র আমার হাতে আসিল; উহার লেখক গোপীনাথ, তিনি বরকান্তা হইতে যাহা লিখিয়াছিলেন তাহার মর্ম এইরূপ ছিল, "আমি শোভাকে দেখিবার জন্য কয়েক দিন হয় আবার এখানে আসিয়াছি। আমার সঙ্গে আরও দুই তিনটী লোক কাশী হইতে আসিয়াছেন। আসিবার সময় কলিকাতায় আপনার সঙ্গে দেখা করিতে পারি নাই। আমি শোভাকে কাশী লইয়া যাইবার ইচ্ছা করিয়াছি, কলিকাতায় অন্যত্র উঠিলে আপনার পক্ষে তাঁহাকে দেখিবার সুবিধা হইবে না বলিয়া তাঁহাকে লইয়া আপনার বাড়ীতেই উঠিব স্থির করিয়াছি। আমার সঙ্গে শোভার পিতা, মাতা ও দুইটি শিশুসমেত মোট

ছয়-সাতটি লোক থাকিবে! কবে কলিকাতায় পৌঁছিব তাহা পরে লিখিতেছি।"

শ্রীযুক্ত গোপীনাথের এই পত্র পাইয়া আমি একেবারে উল্লসিত হইয়া উঠিলাম। কোন্ পুণ্যফলে আমার এই অযাচিত সৌভাগ্যের উদয় হইল তাহা আমার ধারণাতীত। তবে আমি কৃপাবাদী লোক; তাই এই ব্যাপারে ভগবানের সুমহতী কৃপারই খেলা দেখিলাম, এবং তৎক্ষণাৎ টেলিগ্রাফ আফিসে গিয়া শোভা মায়ের পিতাকে তারযোগে সাদর নিমন্ত্রণ জানাইলাম। দুই দিন পরে তারযোগেই শ্রীযুক্ত সুকুমারবাবু জানাইলেন— "আমরা অমুক দিন চট্টগ্রাম মেইল গাড়ীতে আসিতেছি।" দিনটি ঠিক মনে নাই, ২৮শে কি ২৯শে ডিসেম্বর হইবে। আমার বাড়ী হইতে কাহাকেও ষ্টেশনে পাঠাইতে পারি নাই। শ্রীযুক্ত গোপীনাথের অনুরোধে তাঁহার বৈবাহিক এবং বাঙ্গালা গভর্ণ-মেণ্টের ডেপুটি লিগাল রিমেমব্রান্সার শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রনারায়ণ ভট্টাচার্য্য এবং আমাদের গুরুভ্রাতা ও পুলিশ কোর্টের লব্ধ-প্রতিষ্ঠ উকিল শ্রীযুক্ত কেদার নাথ ভৌমিক ষ্টেশনে মোটর পাঠাইয়াছিলেন। গাড়ী শিয়ালদহে পৌঁছিবার নির্দ্দিষ্ট সময়ের পরে দুই ঘণ্টার অধিককাল অতিক্রান্ত হইয়া যায়; তথাপি শোভা মায়েরা আসিয়া পৌঁছিলেন না। তখন তাঁহাদের আগমন-সম্বন্ধে নিরাশ হইয়া নিজেরা আহারাদি করিবার সঙ্কল্প করিতেছি, এমন সময় রাত্রি ১১টার কাছাকাছি দুই খানি মোটর এবং একখানি ট্যাক্সিতে শ্রীযুক্ত গোপীনাথ-প্রভৃতি সহ

শ্রীশ্রীশোভা মা আমার গৃহদ্বারে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। ছোট্ট একটি কিশোরী, আলুলায়িত কেশ, অতি সাদাসিধা কাপড়চোপড়, চক্ষুতে অপূর্ব দীপ্তি এবং গালভরা অনুপম হাসি। "এস মা এস" বলিয়া বাহুতে ধরিয়া বৈঠকখানায় মাকে আনিলাম, ফুলের মালা গলায় দিলাম এবং প্রণাম করিলাম ; কিন্তু মনে ভক্তি অপেক্ষা স্নেহই প্রবল ছিল। তাই ব্যবহারটা মোটের উপর সেই রকমের হইল।

মায়ের সঙ্গে আসিলেন তাঁহার পিতা সুকুমারবাবু, মাতাঠাকুরাণী, ভগিনী সন্ধ্যা ও ভ্রাতা গৌর (উভয়েই শিশু), শিশিরবাবু, শ্রীমতী উষা দেবী (ইনি সধবা ব্রাহ্মণ কন্যা,) ৺সন্তদাস বাবাজীর একখানি তৈলচিত্র এবং একখানি অপেক্ষাকৃত ছোট ফটো এবং বৃন্দাবন আশ্রমের শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণ মূর্ত্তিযুগলের একখানি ফটো। একটি প্রকোষ্ঠ খালি করিয়া এই ঠাকুরদের ছবি রাখা হইল এবং আরতি করিয়া ভোগ ও শয়ন দেওয়া হইল। তৎপর শোভা মা সহ আমরা সকলে প্রসাদ পাইলাম। রাত্রিতে অধিক আলাপ-আলোচনা হইল না।

এবারে মা আমাদের সঙ্গে মাত্র সাত দিন থাকিলেন। এই কয়দিনে তাঁহার দর্শনার্থী লোক খুব বেশী না হইলেও নানাসূত্রে খবর পাইয়া অনেকে আসিয়াছিলেন। বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গের মধ্যে রায় খগেন্দ্রনাথ মিত্র বাহাদুর, ডক্টর মহেন্দ্রনাথ সরকার, অধ্যাপক হারাণচন্দ্র চাকলাদার, অধ্যাপক নৃপেশচন্দ্র গুহ, অধ্যাপক মণীন্দ্রকিশোর চক্রবর্ত্তী, অবসরপ্রাপ্ত

জিলাজজ প্রাণকুমার বসু, উকিল শ্রীযুক্ত কেদারনাথ ভৌমিক, অধ্যাপক নরেশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী, সুগায়ক সাধক রেবতীমোহন সেন, ধর্ম্মপ্রাণ নিবারণচন্দ্র ঘোষ, রায়সাহেব কামাখ্যাকুমার মুখোপাধ্যায়, নবতরু হালদার, জ্ঞানচন্দ্র ব্রহ্মচারী প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। শ্রীযুক্ত (অধুনা পরলোকগত) সুরেন্দ্রনাথ ঠাকুরের পত্নী শ্রীমতী সংজ্ঞা দেবীও প্রত্যহই আসিতেন এবং মাকে অত্যন্ত শ্রদ্ধাপূর্ণ স্নেহ ও আদর করিতেন। পণ্ডিতপ্রবর ৺রাজেন্দ্রনাথ ঘোষের সঙ্গেও এইবারেই অন্য এক বাড়ীতে মায়ের দেখা হয়। সকলেই জানেন ঘোষমহাশয় অদ্বৈতবাদী, মা দ্বৈতাদ্বৈতবাদিনী। ঘোষমহাশয় শ্রীশ্রী৺সন্তদাস বাবাজীর জীবিতাবস্থায় তাঁহার সহিত অনেক তর্কবিতর্ক করিয়াছেন; মায়ের সঙ্গে সেদিন কিছু আলোচনামাত্র করিয়াছিলেন। তিনি জ্যোতিষ এবং করকোষ্ঠী-বিদ্যাতেও ব্যুৎপন্ন। দুই বৎসর পূর্ব্বে শিশিরবাবুর মুখে মায়ের অবস্থার কিছু কিছু বিবরণ শুনিয়া, তাঁহার জীবনে সত্যসত্যই সেরূপ অসাধারণ যোগাযোগ আছে কি না তাহা পরীক্ষা করিয়া দেখিবার জন্য তিনি শিশির-বাবুকে মায়ের রাশিচক্রের নকল পাঠাইয়া দিতে লিখিয়াছিলেন; এবং পরে তাহা পরীক্ষা করিয়া তদ্বিষয়ে নিজের মতও ইং ২০।১।৩৭ তারিখে শিশিরবাবুর নিকট লিখিত এক পত্রে ব্যক্ত করিয়াছিলেন। ঐ পত্র আমি দেখিয়াছি, উহার কিয়দংশ যথাস্থানে উদ্ধৃত হইবে। তৎপর ২।১১।৩৭ তারিখে তিনি মাকে একখানি চিঠি লিখেন, উহাতে শাস্ত্রসম্বন্ধী আটটি

এবং ব্যক্তিগত ছয়টি প্রশ্ন ছিল। মা তাঁহার উত্তর দেন। তৎপর তিনি আরও তিনখানি পত্র লিখিয়াছিলেন এবং উত্তর পাইয়াছিলেন। ঘোষমহাশয়ের এই সকল পত্র আমি দেখি নাই। উভয়ের চাক্ষুষ পরিচয় এই বারই হয়। শুনিয়াছি মায়ের সঙ্গে কিছুক্ষণ আলাপের পর তিনি মায়ের হাতখানি টানিয়া নিয়া কররেখা পরীক্ষা করিয়াছিলেন এবং তাহাতেও তাঁহার অসাধারণত্বের পরিচয় পাইয়াছিলেন।

পণ্ডিতপ্রবর ঘোষমহাশয় এবার মাকে দুইটি ব্যক্তিগত প্রশ্ন করিয়াছিলেন। ১ম—"আমি বেদান্তদর্শন-সম্বন্ধে একখানি পুস্তক লিখিতেছি ; উহা শেষ করিয়া যাইতে পারিব কি না ?" উত্তর "আমি কখনও ঐ শ্রেণীর প্রশ্নের উত্তর দেই না।" দ্বিতীয় প্রশ্ন—"আমার সন্ন্যাস লওয়া হইবে কি না ?" উত্তর —"আসল সন্ন্যাস ত মনের ব্যাপার।" অনেকেই হয়ত জানেন শ্রদ্ধাস্পদ ঘোষমহাশয় পরে রামকৃষ্ণ মিশনে যোগদান করিয়া সন্ন্যাস গ্রহণ করেন, এবং স্বামী চিদ্‌ঘনানন্দ নামে পরিচিত হন। "বালিকা"র শেষোক্ত উক্তিটি সেদিন তিনি কিভাবে গ্রহণ করিয়াছিলেন জানি না। উহা যে গভীর অন্তর্দৃষ্টির পরিচায়ক এবং প্রব্রজ্যায় উৎসুক ব্যক্তির বিশেষ ভাবে ভাবিবার যোগ্য ইহা সকলেই স্বীকার করিবেন।

সপ্তাহ পরে—যতদূর মনে হয় ৫ই জানুয়ারী (১৯৩৯) তারিখে—মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত গোপানাথ শ্রীশ্রীশোভা মা এবং তাঁহার সঙ্গের সকলকে নিয়া কাশী চলিয়া যান।

তাঁহার নিজগৃহে অতিথিদের সকলের অবস্থিতিতে অসুবিধা হইবে বুঝিয়া তাঁহাদের জন্য তিনি একখানি স্বতন্ত্র বাড়ী ভাড়া লইবার ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। তাঁহার ইচ্ছা মাকে তিনি তথায় দুই-তিন মাস রাখিয়া তাঁহার আধ্যাত্মিক অভিজ্ঞতার সকল বিবরণ লিপিবদ্ধ করিয়া জিজ্ঞাসু জগৎকে উপহার দিবেন, অন্যদিকে কাশীর সাধনশীল "মরমী" ব্যক্তিরা তাঁহাকে দেখিবার ও তাঁহার সহিত যথেষ্ট আলাপ-আলোচনারও সুবিধা পাইবেন। কিন্তু শ্রীশ্রী৺অন্নপূর্ণা-কাশীপতির ইচ্ছা অন্যরূপ। তাই গোপানাথ কাশীতে পৌঁছিবার পরে দুই-চারি দিনের মধ্যেই কষ্টদায়ক বাত (Sciatica) রোগে শয্যাশ্রয় করিতে বাধ্য হইলেন। তিনি মায়ের জন্য বাড়ীভাড়া করিয়াছিলেন হরিশ্চন্দ্র ঘাট রোডে। তাঁহার স্বভবন শিগ্রানামক পল্লীতে অবস্থিত। উভয়ের ব্যবধান একক্রোশ বা তদধিক হইবে। গোপীনাথকে উত্থানশক্তি-রহিত ও তজ্জন্য মায়ের সমুচিত তত্ত্বাবধানে অসমর্থ দেখিয়া এবং এই অল্পকালমধ্যেই ভিন্নরুচি ও ভিন্ন সংস্কারের কয়েকটি লোকের মধ্যে একটা বিরুদ্ধভাবের সূচনা লক্ষ্য করিয়া মায়ের মাতাঠাকুরাণী স্বামীর অনুপস্থিতিতে মা ও বিশেষতঃ দুইটি শিশুকে লইয়া গোপীনাথের বাড়ী হইতে অতদূরে থাকিতে সাহস করিলেন না। এইজন্য মাত্র আট-নয় দিন কাশীতে থাকিয়া সুকুমারবাবু সকলকে লইয়া কলিকাতায় ফিরিয়া আসিলেন। শ্রীযুক্ত গোপীনাথ অবশ্য ইহাতে খুবই মর্ম্মাহত হইয়াছিলেন, কিন্তু

তাহার তদানীন্তন অবস্থায় গত্যন্তর ছিল না। পরে দেখা গিয়াছিল গোপীনাথের ব্যারাম বহু দিন স্থায়ী হয় এবং ঐ সময়ে তাঁহার শরীরে একটি অপেক্ষাকৃত কঠিন অস্ত্রোপচারেরও (major operation) প্রয়োজন হইয়াছিল। সুতরাং শোভা মা কাশীতে আরও দুই মাস থাকিয়া আসিলেও গোপীনাথের সকল-পরিকল্পনা কার্য্যে পরিণত হইবার সম্ভাবনা অল্পই ছিল। এদিকে শ্রীভগবান্ মায়ের জন্য কলিকাতায় একটা কর্ম্মক্ষেত্র পূর্ব্বেই প্রস্তুত করিয়া রাখিয়াছিলেন।

মা যখন কাশী যান, তখন তাঁহাকে আরও কয়েকটি দিন আমার গৃহে রাখিবার জন্য আমি ব্যগ্রতা প্রকাশ করিয়াছিলাম। তাঁহাকে ছাড়িয়া দিতে মনে বাস্তবিক কষ্টই হইয়াছিল। কাশী হইতে মা ফিরিয়া আসিয়া আমাকে বলিলেন, "এবার আপনি যতদিন থাকিতে বলিবেন, ততদিন থাকিব। বলুন কবে আমি যাইব।" পূর্ব্বেই বলিয়াছি আমি কৃপাবাদী। মায়ের উক্তিতে আমার জীবনে পুনঃ পুনঃ অনুভূত কৃপারই আর একটি পরিচয় পাইলাম এবং বলিলাম, "যাওয়ার কথা আজই কি? যখন যাওয়ার সময় আসিবে তখন বলিব।" এই ধরণের আরও কিছু হাসি-ঠাট্টা-মিশ্রিত কথার কাটাকাটি হইল। থাকা ত ঠিকই ছিল, যাওয়ার দিন নির্দ্ধারণের প্রস্তাব চাপা দিয়া রাখিলাম। মাকে বলিলাম, "কলিকাতার লোক যতদিন তোমাকে চাহিবে, ততদিন কি প্রকারে তুমি তাহাদিগকে ছাড়িয়া যাইবে? সুকুমারবাবুকেও বলিয়া-কহিয়া

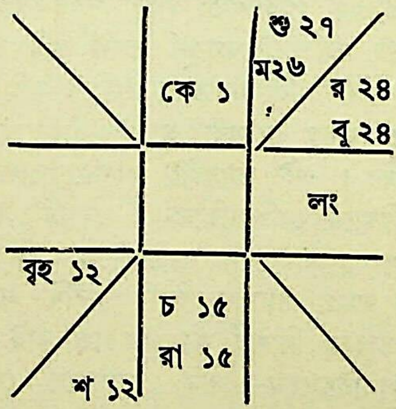
মায়ের কিছুদিন অবস্থান বিষয়ে সম্মত করাইলাম। তিনি একা তাঁহার কর্ম্মস্থল বরকান্তায় চলিয়া গেলেন ; অনুরোধের ভাবেই বলিয়া গেলেন মাকে যেন পনের দিনের বেশী রাখা না হয়। অবশ্য সে বিষয়ে আমি কোনও প্রতিশ্রুতি দিলাম না। মোটের উপর মায়ের কৃপায় এবং তাঁহার পিতার সৌজন্যে আমি ধন্য হইলাম। কৃপাময়ী মা এই অধম দীনের গৃহের "কৃপাকুঞ্জ" নাম সার্থক করিলেন। তাহাতে প্রায় দেড়মাস ব্যাপী আনন্দ-মেলা বসিল। স্ত্রী পুরুষ, যুবক বৃদ্ধ, পণ্ডিত মূর্খ, উকিল এটর্ণি, ডাক্তার হাকিম, দার্শনিক বৈজ্ঞানিক, কবি গায়ক, ছাত্র অধ্যাপক, ধনী নির্ধন, সুস্থ দুঃস্থ, বিশিষ্ট অবিশিষ্ট —সকলশ্রেণীর শত শত লোক মাকে দর্শন ও তাঁহার সঙ্গে অবাধে নানাপ্রকার ধর্ম্মপ্রসঙ্গ করিবার বা তাঁহার মুখ হইতে তাদৃশ প্রসঙ্গ শুনিবার সুযোগ পাইয়াছিলেন। সে সকল কথা পরে কিছু কিছু বলা যাইবে। এখন কিছু পূর্ব্বকথা অগ্রে বলা আবশ্যক মনে করিতেছি। "নামূলং লিখ্যতে কিঞ্চিন্নানপেক্ষিত মুচ্যতে।" অমূলক কিছু লেখা হইবে না, লোকের যাহা শুনিবার আগ্রহ নাই এমন কিছুও বলা হইবে না।

এই পূর্ব্বকথার মূল হইতেছে শ্রীযুক্ত সুকুমারবাবুর ডায়েরী। সুকুমারবাবু কন্যার অবস্থাবিশেষ-বিকাশের সূচনা হইতে শেষ পর্য্যন্ত তাঁহার কার্য্যকলাপের দৈনন্দিন বিবরণ চারিখানি খাতায় লিখিয়া রাখিয়াছেন ; ঐ খাতা কয়খানি তিনি আমার অনুরোধে আমার নিকট রাখিয়া গিয়াছিলেন। এই ডায়েরী সম্বন্ধে

এইখানেই একটি কথা বলা আবশ্যক মনে করিতেছি। সুকুমারবাবু শিক্ষিত লোক; ধর্ম্মবিশ্বাসী হইলেও ইংরাজী-ওয়ালাদিগের চিত্তে সাধারণতঃ যেরূপ সংশয়-প্রবণতা থাকে, তাঁহারও তাহা যথেষ্টই আছে বা ছিল। পিতা হইলেও গোড়ার দিকে বহু দিন পর্য্যন্ত তিনি কন্যার প্রকৃত অবস্থা-সম্বন্ধে কাহারও চেয়ে কম সন্দিগ্ধচিত্ত ছিলেন না এবং পদে পদে অবিশ্বাস বা সন্দেহ ও পরীক্ষাও কম করেন নাই। ইহার প্রমাণ তাহার ডায়েরীর পত্রে পত্রে পাইয়াছি। ঐ ডায়েরীর কিয়দংশ সুকুমারবাবু আমারই বৈঠকখানায় রায় বাহাদুর শ্রীযুক্ত খগেন্দ্রনাথ মিত্র প্রভৃতিকে পড়িয়া শুনাইয়াছিলেন। তাঁহারাও অনেকেই ঐরূপ মন্তব্য করিয়াছেন। তাঁহার পত্নীও জননীর স্বাভাবিক স্নেহবশতঃ অকল্যাণকর কিছু আশঙ্কা করিয়া সর্ব্বদা কন্যার প্রতি উদ্বেগপূর্ণ সতর্ক দৃষ্টি রাখিতেন এবং যখন যাহা লক্ষ্য করিতেন তাহা স্বামীকে বলিতেন। শ্রীযুক্ত শিশিরবাবুরও স্বতন্ত্র ডায়েরী আছে, তাহাতে ঘটনা-অপেক্ষা তত্ত্বকথা অধিক। এই ডায়েরীই মহামহোপাধ্যায় গোপীনাথ কবিরাজ হরিদ্বারে দেখিয়াছিলেন। আমি তাহার কোনও কোনও অংশ সুকুমারবাবুর ডায়েরীতে উদ্ধৃত দেখিয়াছি। শিশিরবাবুর সমগ্র ডায়েরী আমি দেখি নাই। বর্তমান প্রয়োজনে তাহার বিশেষ আবশ্যকতাও নাই। শিশিরবাবু আমাকে জানাইয়াছেন—তিনি শোভাকে যে সকল প্রশ্ন করিয়াছিলেন তাহা অন্যের জন্য, করেন নাই, "কতকটা তাহাকে পরীক্ষা করিবার জন্য কতকটা নিজের কৌতুহল নিবৃত্তির জন্য" করিয়াছিলেন। যাহা হউক প্রসঙ্গক্রমে তাঁহার ডায়েরীর অনেক কথা অবশ্যই আসিয়া পড়িবে।

দুই

শ্রীশ্রীশোভা মায়ের জন্ম শুভ ১৮৪২ শকাব্দের ১৪ই ফাল্গুন শনিবার রাত্রি ২৬ দণ্ডে মকর লগ্নে কৃষ্ণপক্ষের পঞ্চমী তিথিতে স্বাতী নক্ষত্রে তুলা রাশিতে হয়। বাঙ্গলা সন ১৩২৭, ইংরাজী ১৯২১ ফেব্রুযারী মাস। পাঠকগণের মধ্যে যদি কেহ ফলিত জ্যোতিষে অভিজ্ঞ বা অনুরাগী থাকেন তাঁহার কৌতূহলনিবৃত্তির জন্য মায়ের জন্মকুণ্ডলী যেমন আমি পাইয়াছি তাহা অবিকল নিয়ে দিলাম :—



শোভা মাকে দেখিবার পূর্ব্বে তাঁহার জন্মকুণ্ডলী বিচার করিয়া পণ্ডিতবর রাজেন্দ্র ঘোষ মহাশয় শিশিরবাবুকে এক পত্রে এইরূপ লিখেন :—

"তাঁহার জীবনে দৈবানুগ্রহ আছে। ঐ অনুগ্রহের মাত্রা

নিতান্ত অল্প নহে জানিবেন। তিনি ধর্ম্মের জন্যই জন্ম পরিগ্রহ করিয়াছেন। তাঁহার জীবনের উদ্দেশ্যই ধর্ম্মসাধন। ইহা ইঁহার জন্ম অর্থাৎ লগ্নাধিপতি শনি প্রায় পূর্ণবলী হইয়া তুঙ্গাভিলাষী হইয়া নবম ধর্মস্থানে থাকিবার ফল। এই ফলের আধিক্য এবং বৈশিষ্ট্য হইবার হেতু পূর্ণবলী বিদ্যাধিপতি ও কর্ম্মাধিপতি শুক্রের পূর্ণদৃষ্টি এবং মিত্রাধিপতি এবং আয়াধিপতি বলবান্ মঙ্গলগ্রহের উক্ত শনির উপর পূর্ণদৃষ্টি। শনি কঠোরতপস্যা-জনক, শুক্র কবিত্ব ও সূক্ষ্মবিজ্ঞানসম্মত বুদ্ধির জনক এবং মঙ্গল সুদৃঢ় নিশ্চয় ও তর্কশক্তির জনক। সুতরাং শোভা মাতার তীব্র ধর্ম্মপ্রাণতার সহিত কবিকল্পনা, বিজ্ঞানসম্মত সূক্ষ্ম দৃষ্টি এবং সুদৃঢ় যুক্তিসঙ্গত ভাব পূর্ণমাত্রায় মিশ্রিত থাকিবে। তাহার পর সেই শুক্র ও মঙ্গল ব্যয় বা ত্যাগাধিপতি এবং বল, পরাক্রম ও ভ্রাতৃভাবের অধিপতি ধর্ম্মগুরু বৃহস্পতির ক্ষেত্রে থাকায় ও সেই ধর্মগুরু বৃহস্পতির দ্বারা ত্রিপাদ দৃষ্টি প্রাপ্ত হওয়ায় বেদান্তবেদ্য ব্রহ্মের জ্ঞানবৃদ্ধির বিশেষ সহায়তা করিবে। সুতরাং ইঁহার ধর্ম্মভাবের মধ্যে কঠোর তপস্যা, ধর্মপ্রাণতা, তর্কযুক্তিসিদ্ধ মীমাংসা এবং ব্রহ্মবিষয়ক জ্ঞান ও জ্ঞানমিশ্রা ভক্তি এই কয়টি ভাব ফুটিয়া উঠিবে। শনিগ্রহ এই সকল ভাবের সহিত মিলিত হইয়া ধর্ম্মপ্রাণতার সাধক হওয়ায় শোভা মাতা যে ভাবান্তর প্রাপ্ত হন তাহা দৈবানু-গ্রহই বটে। তাহা চিত্তবিকারাদি কোনরূপ হেয় ভাব নহে। * * ইনি নিষ্পাপশরীর, দেহান্তে অতি উত্তম স্বর্গে গমন

করিবেন, ইহা মৃত্যুর স্থানে স্থিত বৃহস্পতির ফল জানিবেন। পত্রে এ বিষয়ে বেশী লেখা যায় না। ইহার পিতামাতা ধন্য যে এরূপ কন্যা লাভ করিয়াছেন। * * *”

ঘোষমহাশয়ের পত্রে আয়ু ইত্যাদি সম্বন্ধেও কিছু আলোচনা ছিল, কিন্তু সুনিশ্চিত সিদ্ধান্ত ছিল না। তিনি লিখিয়াছিলেন উহার বিচার আরও অধিক সময়সাপেক্ষ।

শোভা মায়ের পিতার নাম পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে। তাঁহাদের নিবাস ত্রিপুরা জিলার ব্রাহ্মণবাড়িয়া মহকুমার অন্তর্গত কোণ্ডা-নামক গ্রামে। জাতিতে কায়স্থ; বংশটি নিজ সমাজে প্রতিষ্ঠাপন্ন। শোভামায়ের মাতামহের নাম ৺যোগেন্দ্র-মোহন পালিত, ইনি প্রথমে উকিল ও পরে শ্রীহট্ট জিলার হবিগঞ্জ মহকুমার অন্তর্গত বানিয়াচঙ্গের খাঁ বাহাদুর ওয়ার্ড এষ্টেটের ম্যানেজার ছিলেন। ইঁহাদের নিবাস হবিগঞ্জ মহকুমারই অন্তর্গত করাব গ্রামে। এই গ্রামটি শ্রীশ্রীসন্তদাস বাবাজী মহারাজের জন্মস্থান বামৈ গ্রাম হইতে পাঁচ মাইল দূরে অবস্থিত। পালিত মহাশয়ের সহিত বাবাজী মহারাজের বন্ধুতা ছিল এবং বৃদ্ধ বয়সেও (১৩৩৮ সালে) হবিগঞ্জ হইতে যখন তিনি বানিয়াচঙ্গ যান, তখন অল্পকালের জন্য পালিত মহাশয়ের গৃহে গিয়া তাঁহার এবং শোভা সহ তাঁহার পরিবারস্থ সকলের প্রণাম লইয়া আসেন। বাবাজী মহারাজের সহিত শোভামার এই প্রথম সাক্ষাৎ।

শোভা মায়ের বাল্যজীবনের অন্য উল্লেখযোগ্য কোনও

ঘটনা আমি শুনি নাই। কিন্তু জন্মকালীন একটি ঘটনা আমি তাঁহার পিতার এক পত্রে অবগত হইয়াছি। ঐ সময়ে তিনি (সুকুমারবাবু) হবিগঞ্জে নিউ হাই স্কুল-নামক একটি নব-প্রতিষ্ঠিত উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক ছিলেন। শোভার জন্ম হয় তাঁহার মাতামহের কর্মস্থল বানিয়াচঙ্গ গ্রামে। যে রাত্রিতে জন্ম হয়, তাহারই শেষভাগে হবিগঞ্জে সুকুমারবাবুর জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা শচীন্দ্রবাবুর স্ত্রী স্বপ্নে দেখেন যে, সুকুমারবাবুর শয়নগৃহে একখানি আসনের উপরে শ্রীশ্রীকালী মাতার যে একখানি ছবি সর্ব্বদা থাকিত, সেই ছবিখানি হইতে কালীমাতা যেন একটি শিশু হইয়া মাটিতে নামিয়া আসিয়াছেন। তাঁহার সর্বগাত্র ধূলি ও কর্দ্দমে লিপ্তপ্রায়। সুকুমারবাবু যেন পটে মাকে না দেখিয়া খুঁজতে খুঁজিতে ক্লান্ত হইয়া হঠাৎ শিশুটিকে দেখিতে পান এবং তাহার একখানি হাত ধরিয়া বৌদিদিকে বলেন, "দেখুন, এই পাগলী কোথা হইতে ধূলা-কাদা মাখিয়া আসিয়াছে।" এই কথা বলিয়া সুকুমারবাবু যেন মেয়েটিকে কোলে তুলিয়া লইলেন, আর অমনি তাঁহার বৌদিদির স্বপ্নের বিবরণ প্রত্যূষেই সুকুমারবাবুকে জানাইয়া বৌদিদি বলেন, "এবার কন্যাই হইবে।" ন্যূনাধিক ঘণ্টা দেড়েক পরে বানিয়াচঙ্গ হইতে লোক মারফত খবর আসিল—কন্যা হইয়াছে। স্বপ্ন কি সবই অমূলক চিন্তামাত্র? এই স্বপ্নটি সম্বন্ধে সেই চিরন্তন প্রশ্নের উত্তর পাঠক নিজেই পরে দিবেন।

মায়ের আধ্যাত্মিক উৎকর্ষের বিকাশ বাহ্যদৃষ্টিতে আরব্ধ হয় ১৩৪২ সালের অগ্রহায়ণ মাসের শেষভাগে। তখন তাঁহার বয়স ১৫ বৎসর পূর্ণ হয় নাই। ইহার কিছু দিন পূর্ব্বে মূর্চ্ছা বা হিষ্টিরিয়া রোগের মত একটা অবস্থান্তর দেখা গিয়াছিল। তখনও তাঁহাকে নিজের বুকে "ওঁ" এবং "মা" এই দুইটি শব্দ অঙ্গুলিদ্বারা লিখিতে তাঁহার স্বজনগণ দেখিয়াছিলেন। পরে স্পষ্টই জানা গিয়াছে ঐ অবস্থাটি বাস্তবিক কোনও ব্যাধিজনিত বিকার নহে, বাস্তবিকপক্ষে তখনই তিনি সাধনরাজ্যের প্রথম ভূমিতে আরোহণ করেন। ঐ ভূমিতেই পরে বর্ণনীয় অবস্থাসমূহের বিকাশ হইতে থাকে। এই সম্পর্কে পণ্ডিতবর রাজেন্দ্রনাথ ঘোষ মহাশয়ের কোষ্ঠী-বিচারলব্ধ মতও (যাহা উপরে দেওয়া হইয়াছে) স্মরণীয় —"শনিগ্রহ এই সকল ভাবের সহিত মিলিত হইয়া ধর্ম-প্রাণতার সাধক হওয়ায় শোভা মাতা যে ভাবান্তর প্রাপ্ত হন তাহা দৈবানুগ্রহই বটে। তাহা চিত্তবিকারাদি কোনরূপ হেয় ভাব নহে।"

পনের বৎসর বয়সে গ্রাম্য বালিকার শিক্ষা যেরূপ হয়, বালিকা শোভার শিক্ষা তাহা অপেক্ষা বিশেষ উন্নত রকমের হইয়াছিল তাহার কোনও প্রমাণ নাই। আমি যখন তাঁহাকে দেখিয়াছি তখন তিনি ইংরাজী দুই-চারিটি শব্দমাত্র জানেন, বাঙ্গালাতে কথা গুছাইয়া লিখিতে পারেন; অবশ্য বর্ণাশুদ্ধি হয়। কথা গুছাইয়া লিখিবার ক্ষমতা বিশেষভাবেই উল্লেখ-

যোগ্য, কেননা দীর্ঘ এবং বহু জিজ্ঞাস্য বিষয়পূর্ণ পত্রও তাঁহাকে একবারমাত্র পড়িয়া সকল জিজ্ঞাস্য বিষয়ের উত্তর যথাযথভাবে গুছাইয়া বেশ দ্রুতই উত্তর লিখিতে দেখিয়াছি। এ ক্ষমতা সাধনের পূর্বে থাকা সম্ভব নয়। ইহা সম্ভবতঃ পরে লব্ধ পরচিত্তজ্ঞতার ফল।

কোণ্ডার রাহা-পরিবার পুরুষানুক্রমে আনুষ্ঠানিক শাক্ত পরিবার ছিল। বংশের ধারা-অনুসারে, এবং পরে দেখিব পূর্ব জন্মের বিশিষ্ট সংস্কারবশতঃ, শ্রীযুক্ত সুকুমার রাহা আবাল্য ৺কালীভক্ত ছিলেন। তিনি সাত-আট বৎসর বয়সে মাতৃহীন হন। উহার কয়েক দিন পরে তিনি কোনও ব্রাহ্মণের নিকট হইতে ৺কালীমাতার একখানি পট প্রাপ্ত হন। সেইটি তিনি আসনে রাখিয়া দিয়াছিলেন এবং বাল্যাবধি ঐ পটের পা ধোয়াইয়া চরণামৃত পান করিতেন। ঐ ছবি বরাবর তাঁহার গৃহে একটি আসনে স্থাপিত ছিল এবং এখনও আছে। তিনি দীক্ষার পূর্ব পর্য্যন্ত ঐ পটের পায়ে রক্তচন্দন দিতেন, পরে তাহা বন্ধ করিয়াছিলেন, কিন্তু ছবিটি আসন হইতে সরান নাই। এই বিষয়ে আরও কিছু পরে শুনা যাইবে। ছাত্রাবস্থায় মেসেও ৺কালীর একখানি ছবি সুকুমারবাবুর সঙ্গে থাকিত। তিনি উহা প্রণাম করিয়া সকল কর্মে প্রবৃত্ত হইতেন। পরীক্ষা দিতে যাইবার সময় কলমটি চিত্রগতা ৺কালীর পায়ে স্পর্শ করাইয়া যাইতেন। কিন্তু ব্রজবিদেহী ৺সন্তদাস বাবাজীর পরলোক গমনের কিছুদিন পূর্ব্বে অর্থাৎ

১৩৪২ সালের আষাঢ় মাসের শেষভাগে সুকুমারবাবু কুমিল্লায় তাঁহাকে দর্শন করিয়া তাঁহার প্রতি খুব আকৃষ্ট হন, এবং সপরিবারে তাঁহার নিকট দীক্ষাপ্রার্থী হন। ২৮ শে আষাঢ় তারিখে তাঁহাদের দীক্ষা হয়। আশ্চর্য্যের বিষয় মহাপুরুষ অগ্রে অর্থাৎ বেলা ৯টা-১০টার সময় তাঁহাদের বালিকা কন্যা শোভাকে "নাম" দিয়া, তৎপর অনুমান বেলা ১২টার সময় পিতা ও মাতাকে দীক্ষা দিয়াছিলেন। এই স্থানে উল্লেখ করা যাইতে পারে যে, শ্রীশ্রী৺সন্তদাস বাবাজীর সম্প্রদায়ে "নাম" দেওয়া ও "দীক্ষা" দেওয়া দুইটি স্বতন্ত্র ব্যাপার; দু'য়ে একটু প্রভেদ আছে। নাম দেওয়া ব্যাপারে কেবল নামই দেওয়া হয়, বীজ দেওয়া হয় না, দীক্ষাতে নাম ও বীজ দুইই দেওয়া হয়, অনুষ্ঠানও ভিন্ন। নাম নিলে তিলকধারণ করিতে হয় না —অবশ্য করিতে বাধা নাই; তবে গুরু সেরূপ আদেশ দেন না; মালাধারণও গুরু নির্দ্দেশ দিলে তবেই করিতে হয়। কিন্তু দীক্ষা গ্রহণ করিলে মালা-তিলক উভয়ই অবশ্য ধারণ করিতে হয়। দুই ব্যাপারে শক্তিরও ইতর-বিশেষ আছে, দীক্ষার শক্তি অধিক। তবে শোভা মা বলেন যে, সদ্‌গুরু যদি শুধু নামই দেন, তাহা হইলেও শেষ পর্য্যন্ত সব ফলই পাওয়া যায়। সে যাহা হউক বুঝা যায় বালিকা বলিয়াই গুরুজী মহারাজ শোভাকে কেবল নামই দিয়াছিলেন। অথবা ইহার পরে তিনি এই বালিকাকে নিয়া অনেক খেলা খেলিবেন বলিয়া প্রথমে নাম দিয়া কেবল চিহ্নিত করিয়া রাখিয়াছিলেন।

বিশেষ লক্ষ্য করিবার বিষয় এই যে, গুরু বাপ-মার সম্বন্ধের বলে মেয়েকে দীক্ষা দেন নাই; প্রথমে মেয়েকেই শিষ্যা করিয়া তাঁহার সহিত সম্বন্ধের বলে বাপ-মাকে দীক্ষা দিয়াছিলেন। এই পৌর্ব্বাপর্য্য যে গুরুর ইচ্ছাকৃত তাহা পরে প্রকাশ পাইয়াছে।

সে যাহা হউক এখন হইতে সুকুমারবাবুর ডায়েরী অনুসরণ করিয়া চলিব।

বাঙ্গালা ১৩৪২ সালের ২৪শে অগ্রহায়ণ (ইং ডিসেম্বর, ১৯৩৫) মঙ্গলবার রাত্রি আটটার সময় সুকুমারবাবু তাঁহার গুরুভ্রাতা ডাঃ সতীশচন্দ্র নন্দীর বাসায় বসিয়া গীতা পাঠ করিতেছিলেন এমন সময় তাঁহার এক পুত্র, সবুজ, ব্যস্ত-সমস্তভাবে আসিয়া তাঁহাকে সত্বর নিজবাসায় ফিরিয়া যাইতে বলে। সুকুমারবাবু ফিরিয়া আসিয়া দেখিলেন তাঁহার গুরুজী মহারাজের ফটোর সম্মুখে শোভা চক্ষু নিমীলিত করিয়া যেন ধ্যানে নিরতা। চক্ষু দিয়া জলধারা বহিতেছে, ওষ্ঠ কম্পিত হইতেছে, শরীরও কাঁপিতেছে। ইহার কয়েকবৎসর পূর্বে শোভার হিষ্টিরিয়ার মত একটা ব্যারাম বা অবস্থা হইয়াছিল। সুকুমারবাবু ভাবিলেন এটা ঐ রোগেরই পুনরাক্রমণ। ভূতাবেশ বলিয়াও ভয় করিলেন এবং সেইজন্য তিনি ও তাঁর স্ত্রী "জোরে জোরে নাম করিতে" লাগিলেন। শোভাও বিড়বিড় করিয়া কিছু বলিতেছিলেন। তুইটি কথা বুঝা গিয়াছিল— "পারি না", "সময় হয় না"। অনেকক্ষণ পরে ঐ অবস্থাটা

কাটিয়া গেলে তাঁহাকে প্রশ্ন করিয়া এইরূপ জানা গেল :—

শোভা পিতার খাটে বসিয়া পড়া করিতেছিলেন ; আলস্য-বোধ হওয়ায় শুইয়া পড়েন। এমন সময় একটা স্নিগ্ধ উজ্জ্বল আলোকে সমস্ত ঘরটি আলোকিত হইয়া উঠে এবং সঙ্গে সঙ্গে সন্তদাস বাবাজীর মূর্ত্তি প্রকটিত হয়। তিনি শোভাকে ঠাকুরঘরে যাইতে বলেন এবং সেখানে শোভা তাঁহারই নির্দ্দেশমত তাঁহার পূজা করেন।

ইহার পূর্বে শোভা মাত্র পাঁচ সাত মিনিট করিয়া নাম করিতেন, তাহাও যে খুব নিষ্ঠার সহিত করিতেন তাহা নহে। সেই জন্য সুকুমারবাবু কন্যাকে বলিতেন, "রীতিমত নাম নিস্ না ব'লে বাবা বোধ করি তোকে খুব ধমক দিলেন ?" কন্যা উত্তর করিলেন, "ধমক্ ? কি যে স্নেহ করলেন, যদি দেখ্‌তে !"

ইহার পর দিন, অর্থাৎ ২৫শে অগ্রহায়ণ শোভা বাহ্যজ্ঞানশূন্য-ভাবে দুই ঘণ্টাকাল বসিয়া নাম করেন। তৎপূর্বে তিনি পিতার নির্দ্দেশ অনুসারে বাবাজী মহারাজের মঙ্গলারতি করিয়াছেন। নাম করার পর শোভা বলেন, "বাবাজী মহারাজ বলিলেন, 'ওরকম করিয়া মঙ্গলারতি করিতে হয় না'। তার পর যেভাবে করিতে হয় তাহা তিনি নিজে আমাকে দেখাইয়া দিলেন।" এই দিন সন্ধ্যায় জপের সময় তাঁহাকে গুরুজীর আসনের সম্মুখে নিজের আঁচল বিছাইয়া দিতে দেখা যায়। জপের অন্তে প্রকাশ পাইল, বাবাজী মহারাজ আসিয়া নিজের পা রাখিবার

জন্য আসনের নীচে কিছু বিছাইয়া দিতে বলিয়াছিলেন। ২৬শে তারিখে ঐ স্থানে একটি আসনই রাখা হইয়াছিল। সেদিন শোভাকে ঐ আসনের উপর যেন গুরু পা রাখিয়াছেন এইভাবে পূজাবন্দনাদি করিতে দেখা গেল। শোভা বলেন তিনি যে ফুল দিয়া পূজা করিলেন তাহা গুরুজীরই দেওয়া; অবশ্য তাহা অন্যের অদৃশ্য ছিল। সেদিন গুরুজী তাঁহাকে বলিয়া গিয়াছিলেন তিনি যেন তাঁহাকে দেখিয়া ভয় না পান; তাঁহার রক্তমাংসের দেহটাই নাই, কিন্তু তিনি আছেন।

২৭শে তারিখে কয়েকটি ভীষণাকৃতি লোক আসিয়া না কি শোভাকে ভয় দেখায়। তখন তিনি গুরুকে স্মরণ করাতে তাহারা পলাইয়া যায়।

২৮শে তারিখে দেখা গেল শোভা যেন গুরুর পা টিপিয়া দিতেছেন। পূজান্তে তিনি বলেন, 'বাবাজী মহারাজ পা টিপিয়া দিতে বলিয়াছিলেন।' এইদিনের ডায়েরীতে সুকুমারবাবু লিখিয়াছেন, "শোভা নাম করিতে বসিয়া কিছুক্ষণ নাম করে; পরে সসম্ভ্রমে হাঁটু গাড়িয়া প্রণাম করে; তখনই বোধ করি গুরুর আবির্ভাব হয়। ইহার পর তাঁহার চোখ দিয়া জল গড়াইতে থাকে। কখনও কখনও বিড়বিড় করিয়া কিছু বলে। তারপর চুপচাপ। শেষ দিকে অঞ্জলি, পা টেপা—এইসব হয়।"

২৯শে তারিখে বাবাজী মহারাজের সঙ্গে "দাদাগুরুজী অর্থাৎ শ্রীশ্রীরামদাস কাঠিয়া বাবা আসিয়া আসনে দাঁড়াইয়াছিলেন। তিনি কোনও কথা বলেন নাই, বাবাজী মহারাজই

কথা বলেন। ঐদিন রাত্রিতে বাবাজীর সঙ্গে তাঁহার পূর্বাশ্রমের স্ত্রী দেখা দেন। তিনিও কোন-কথা বলেন নাই। গুরুমার বিবরণ শোভা যেরূপ দেন তাহাতে সুকুমারবাবুর বিশ্বাস হইয়াছিল যে, শোভা ঠিকই দেখিয়াছেন। তিনি দীক্ষার বহুবৎসর পূর্বে (ইং ১৯১৩-১৪ সনে) কলিকাতায় ৪৭নং বোসপাড়া লেনে তাঁহাদের বাড়ীতে তাঁহাকে দেখিয়াছিলেন, এবং ঐ সময়ে তাঁহার ভবিষ্যৎ গুরুমাতা স্বহস্তে তাঁহাকে জলখাবার দিয়াছিলেন।

শোভা কি ভাবে জপপূজা-অর্চ্চনাদি করেন তাহা ২১শে পৌষ রাত্রিতে তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করা হইলে তিনি এরূপ বলেন : "আমি আসনে বসিয়া বাবার দেওয়া নাম জপ করিতে আরম্ভ করিলে, ২।১ মিনিট পরে আমার জিহ্বা দিয়া আর উচ্চারণ হয় না, কিন্তু ভিতরে আপনা হইতে নাম হইতে থাকে। তখন হঠাৎ বাবাজী মহারাজকে সম্মুখে দেখিতে পাই। তিনি আসনে বসিবার অল্প পরে আমি তাঁহার কোলে মাথা রাখি, তখনও ভিতরে নামজপ চলিতে থাকে। যেদিন তিনি আমার মাথায় হাত দেন, সেদিন আমার সমস্ত শরীর অবশ হইয়া যায়। তার পর কি যে হয় তাহা আমি বলিতে পারি না; এমন একটা আনন্দ বোধ হইতে থাকে যাহা বর্ণনা করা যায় না। কিছুক্ষণ পরে আমি বাবার কোল হইতে মাথা উঠাই এবং আবার সোজা হইয়া বসিয়া নাম করিতে থাকি। শেষের দিকে আমার মাথার উপরে

রাধাকৃষ্ণের যুগলমূর্ত্তি জ্বল্‌জ্বল্‌ করিতে থাকে। বাবা ঐ মূর্ত্তি আসনে স্থাপন করিতে বলেন। তখন আমি ঐ মূর্ত্তি হাত দিয়া নামাইয়া আসনে রাখি। অমনি দাদাগুরুজীকে ও একটী শাল-গ্রামকে আসনে দেখিতে পাই। তখন বাবা দাঁড়াইয়া থাকেন ও তাঁহাদের পূজা করিতে বলেন, কি ভাবে পূজা করিতে হইবে তাহাও বলিয়া দেন। পূজা হইলে ভোগ দেই, অঞ্জলি দেই, আরতি করি, চরণামৃত খাই। ফুল, ধূপ, দীপ, ভোগের জিনিষ সব হাতের কাছেই পাই। অঞ্জলির ফুল বাবা আমার হাতে তুলিয়া দেন। পূজা শেষ হইলে প্রণাম করিতে বলেন, তার পর বলেন, 'যাও'। তখন চক্ষু মেলিয়া চাহি এবং আর সে-সব কিছু দেখিতে পাই না। অঞ্জলির ফুলের মধ্যে কেবল তুধজবা ফুল বাগানে দেখিতে পাই, অন্য সব ফুল কোনও বাগানে দেখা যায় না। প্রসাদের কি অপূর্ব স্বাদ! মনে কোনও প্রশ্ন উঠিলে জিজ্ঞাসা না করিলেও বাবা উত্তর দিয়া যান।"

২৪শে পৌষ শোভা বলেন, সমাধির সময় পাঁচজন মহা-পুরুষ আসিয়াছিলেন, তাঁহাদের চেহারা দেখিলেই ভক্তি হয়। বাবাজী জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি এদের কাছ থেকে মন্ত্র নিতে চাও?" শোভা বলেন, "না, তুমি আমাকে যাহা দিয়াছ তাহাই চাই।" এক দিন একটি ছোট কালো সুন্দর ছেলে বাবাজীর সঙ্গে আসিয়াছিল। বাবাজী শোভাকে বলেন, "তোকে এই ছেলে দিলুম।" শোভা বলিলেন, "আমি ছেলে

দিয়া কি করিব?" বাবাজী বলিলেন; "এর হাতে মাখন দাও, দিলেই এ নাচিবে।" শোভা মাখন দিলেন, আর ছেলেটি আনন্দে নাচিতে লাগিল। ভারী সুন্দর দৃশ্য। অল্পক্ষণ পরে শোভা দেখেন সে ছোট ছেলেটি আর নাই।

২৬শে পৌষ শোভা পূজার আসনে হঠাৎ ৺কালীমাতার মূর্ত্তি দেখিতে পান। বাবাজী মহারাজ শোভাকে জিজ্ঞাসা করেন, "তুমি ইহাকে চেন?" শোভা উত্তর করেন, "চিনি, আমার বাবা পূর্বে ইঁহারই পূজা করিতেন।" অল্পক্ষণ পরে ৺কালীমাতা শোভাকে আশীর্বাদ করিয়া চলিয়া যান। এইদিন পূর্বোক্ত ছোট ছেলেটি তুইবার আসিয়া মাখন পাইয়া নৃত্য করে। বাবাজী বলেন—"ইহার নাম যাতুবাছাধন।" (ডায়েরীর এইটুকু পড়িয়া নরোত্তম দাসের "যশোদা রাখিল নাম যাতুবাছাধন এই পয়ারাংশ মনে পড়ে।)

২৭শে পৌষ বাবাজী মহারাজ শোভাকে বলেন, "এখন হইতে ৺ঠাকুরজী তোমাকে শিক্ষা দিবেন। গুরুকৃপা শেষ হ'ল, ঠাকুরের কৃপা আরম্ভ হ'ল।" রাত্রিতে আবার ঐ কথাটাই বুঝাইয়া বলেন, "আগে গুরু কৃপা করেন, তিনি অনেকখানি আগাইয়া দিলে ৺ঠাকুর ভার নেন।"

২৮শে পৌষ প্রাতে প্রথমে শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণ আসিয়া আসনে দাঁড়ান, পরে বাবাজী আসিয়া আসনে বসেন।

এ কথা বলা বোধ করি বাহুল্য যে, এই রকমের সকল দর্শন

এক শোভারই হয়, অন্য কেহ কিছু দেখে না, তাহারা কেবল শোভার অঙ্গভঙ্গীমাত্র দেখিতে পায়। শোভার দর্শন-শ্রবণাদির যে সকল বিবরণ তাঁহার পিতার ডায়েরী হইতে উদ্ধৃত করা হইতেছে, তৎসমুদয় শোভার কথিত বুঝিতে হইবে।

শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন, "আমার পায়ের উপর মাথা রাখ!" শোভা তাহাই করেন। ঐ সময়ে পূর্বের মত ভিতরে জপ চলিতেছিল। তারপর শ্রীকৃষ্ণ শোভাকে তাঁহার গুরুর কোলে মাথা রাখিতে বলেন। কিছুক্ষণ পরে গুরুর কোল হইতে মাথা তুলিয়া শোভা দেখেন চারিদিকে নানা দেবদেবী, সকলেরই মুখে হাসি। এক দিন ছোট ছেলেটি, "যাদুবাছাধন", তাঁহাদের সকলের সম্মুখে খুব নাচিয়াছিল এবং তাহাতে সকলে খুব খুশী হইয়াছিলেন। শোভা শ্রীকৃষ্ণের আদেশে তাঁহার হাত হইতে মাখন লইয়া যাদুবাছাধনকে খাইতে দেন, তাহাতে সে আরও নাচিতে থাকে। ঠাকুর বলিলেন, "আমি ছোট্ট সময়ে এমনটিই ছিলাম।" ইহার পর শোভা ঠাকুরের পায়ে পুনরায় মাথা রাখিলে দেবদেবীগণ তাঁহাকে আশীর্বাদ করিয়া চলিয়া গেলেন। শ্রীরাধারাণী কোনও কথা বলেন নাই।

এই দিন শোভা তাঁহার পিতার প্রশ্নে বলেন, "এখন নাম নিতে বসিলেই মাথার উপর অত্যন্ত উজ্জ্বল রাধাকৃষ্ণ-মূর্ত্তি দেখিতে পাই। দু-এক মিনিট পরে তাঁহারা আপনি নামিয়া আসনে দাঁড়ান। পূজা করিবার সময় যে-সব দেবদেবী দেখিয়াছিলাম, এখনও কোনও কোনও সময় শূন্যে আমার

সামনে তাঁহাদিগকে দেখিতে পাইতেছি—কালী, দুর্গা, বিষ্ণু (হাতে চক্র) আরও অনেককে। ঠাকুর বলিয়াছিলেন, 'এসবই আমি, আমারই ভিন্ন ভিন্ন রূপ। তবে ভিন্ন ভিন্ন মূর্ত্তির পূজা ভিন্ন ভিন্ন।"

২৯শে পৌষ, সংক্রান্তির দিন শোভা পিঠা দধি ইত্যাদি ঠাকুরকে নিবেদন করিলে তিনি বলেন, "চিড়া দিলে না কেন?" (পূর্ববঙ্গে অনেক অঞ্চলে পৌষ-সংক্রান্তির দিনে মধ্যাহ্নে দধি চিড়া ভোজনের রীতি আছে।) তখন শোভা বলেন, "তুমি ত আতপ চিড়া ভিন্ন খাবে না, আমাদের সব সিদ্ধ ধানের চিড়া।" ঠাকুর সিদ্ধ ধানের চিড়াই খাইবেন বলাতে শোভা আসন হইতে উঠিয়া চিড়া নিয়া গিয়া ঠাকুরকে নিবেদন করেন। বিকালের দিকে সিদ্ধ চাউলের ভাত নিবেদন করিতে বসিলে দেখা গেল শোভার চক্ষু হইতে অজস্র জল গড়াইয়া পড়িতেছে। তার কিছুক্ষণ পরে দেখা গেল হাত না ধুইয়াই আরতি করিতেছেন। ভাবাবস্থা ভাঙ্গিয়া গেলে তিনি প্রকাশ করেন, বাবাজী মহারাজ ভোগনিবেদনের যে মন্ত্র তাঁহাকে শিখাইয়া দিয়াছিলেন, সেই মন্ত্র দ্বারা অন্ন নিবেদন করা মাত্র ঠাকুর আসিয়া বলেন, "আমাকে ডেকেছ?" শোভা বলেন, "কই? ডাকি নাই ত!"

ঠাকুর—হাঁ, ডেকেছ, আমি খাব।

শোভা—(অনেকক্ষণ ভাবিয়া) এই সামান্য অন্ন তুমি খাবে?

ঠাকুর—আমি যেমন ভাল খাই, তেমনি খারাপও খাই।

এই বলিয়া ঠাকুর খাইতে থাকেন এবং সঙ্গে নানা দেবদেবী আসিয়া খাইতে থাকেন। রাত্রিতেও ভাত নিবেদন করিবার সময় বিকালের মত ব্যাপার হয়। অতিরিক্ত দেখা গিয়েছিল শোভা পা দিয়া তাল দিতেছেন! পরে জানা গেল, ঠাকুর অন্নগ্রহণ করিয়া নৃত্য করিতেছিলেন এবং শোভাকে তাল দিতে বলিয়াছিলেন।

১লা মাঘ শোভা পূজায় বসিয়া মুখে একরকম আওয়াজ করিতেছিলেন। পূজার অন্তে তিনি প্রকাশ করেন যে, ঐদিন ঠাকুরের সঙ্গে শোভা গরু চরাইতে গিয়াছিলেন। পর দিন ঠাকুর শোভার সঙ্গে ষোলকাটি (?) খেলা খেলিতে বসিয়া হারিয়া যান, তারপর শ্রীশ্রীরাধারাণী খেলিতে বসিলে শোভার হার হয়।

৩রা মাঘ শোভা পূজা করিতে করিতে উঠিয়া বংশীধারী শ্রীকৃষ্ণের ভঙ্গীতে দাঁড়ান। কিছুক্ষণ পরে ৺কালীমাতার ভঙ্গীতে দাঁড়ান। পরে জানা গিয়াছিল ঠাকুরই শোভাকে ঐ ভাবে দাঁড় করাইয়া দেন।

তিন

এই সময়েই বা ইহার কিছু পূর্বে সুকুমারবাবুর পত্র পাইয়া তদীয় ভ্রাতুষ্পুত্র শিশিরবাবু শোভার অবস্থা দর্শন ও বিচার করিবার জন্য বৃন্দাবন হইতে আসেন। তিনি সর্বদা গুরুর কাছে থাকিতেন, তাঁহার চিঠিপত্রাদি লিখিতেন, শাস্ত্রাদিও কিছু কিছু পড়িয়াছেন এবং তৎসম্বন্ধে পরমজ্ঞানী গুরুর মুখে শুনিয়াছেন আরও অধিক। এইজন্যই শোভার অবস্থা সম্বন্ধে স্বয়ং কোন সিদ্ধান্ত করিতে সাহসী না হইয়া সুকুমারবাবু শিশিরবাবুকে আহ্বান করেন। পরে আরও দুইটি ব্যক্তি শোভার অবস্থা-সম্বন্ধে সংবাদ পাইয়া কৌতূহলী হইয়া তাঁহাকে দেখিতে যান। এক—শ্রীমান্ বাবু দেবহরি দে, বি. এস্-সি ; ইঁহার বাড়ী চব্বিশ পরগণা জিলায় এবং ইনি কোনও বিখ্যাত ঘৃতের ব্যবসায়ে রাসায়নিক পরীক্ষকের কাজ করিতেছিলেন। ইনিও শ্রীশ্রী৺সন্তদাস বাবাজীর শিষ্য ; বয়সে যুবক. গুরুর রচিত গ্রন্থাদি পড়িয়া তন্নির্দ্দিষ্ট সাধনাদিও ভক্তি-সহকারে করিতেছিলেন। ইনিই মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত গোপী-নাথ কবিরাজকে প্রথমবার কলিকাতা হইতে বরকান্তা লইয়া যান। আর এক জন হইতেছেন শ্রীমতী উষাদেবী। ইঁহার কথাও পূর্বে একবার বলিয়াছি। ইনিও ৺সন্তদাস বাবাজীর শিষ্যা ; সংসারে সুখ নাই বলিয়া অনেক সময়ে গুরুজী

মহারাজের আশ্রয়ে থাকিতেন এবং গুরুসেবা ও ঠাকুরসেবায় নিষ্ঠা দ্বারা তাঁহার বিশেষ স্নেহের পাত্রী হইয়াছিলেন। ইনি ময়মনসিংহ সহরে পিত্রালয়ে বেশী থাকিতেন।

ফাল্গুন মাস। শোভা পিতার ভদ্রাসন কোণ্ডা গ্রামে আসিয়াছেন। দেবহরি দে ও ঊষা মাও এইখানে। ২২শে (ফাল্গুন) তারিখে দেবহরি শোভাকে বাটীস্থ বিগ্রহের আরতি করিতে বলেন। স্থাপিত বিগ্রহের সম্মুখে ইতঃপূর্বে শোভা কখনও আরতি করেন নাই, পদ্ধতিও জানিতেন না। দেবহরির উক্ত অনুরোধে তিনি বাবাজী মহারাজের ছবির সম্মুখে প্রণাম করিয়া উঠিয়া বলিলেন, "হ্যাঁ, আমিই আরতি করিব; বাবা দেখাইয়া দিবেন বলিলেন।"

আরতি আরম্ভ হইল, কিন্তু অল্পক্ষণ পরেই দেখা গেল যেখানে বিগ্রহ আছেন সেখানে আরতি হইতেছে না। শোভার দৃষ্টি এদিকে ওদিকে ঘুরিতেছে; চক্ষুদ্বয় বিস্ফারিত, মুখে মৃদু মৃদু হাসি, মধ্যে মধ্যে সম্মতি সূচকভাবে মাথা নাড়িতেছেন। সকলে অবাক্ হইয়া এই মনোরম দৃশ্য দেখিতে লাগিলেন। আরতির অন্তে বাহ্যদশা ফিরিয়া আসিলে পিতার প্রশ্নোত্তরে শোভা বলিলেন যে আরতির সময় তিনি বিগ্রহ বা আসন কিছুই দেখেন নাই; দেখিলেন ঠাকুরজী দাঁড়াইয়া আছেন এবং অনেক দেবদেবী সমুপস্থিত। বাবাজী মহারাজ যেখানে যেভাবে আরতি করিতে বলিলেন, সেইভাবে তিনি সেইখানে আরতি করিলেন।

পরদিন সুকুমারবাবু গুরুজীর ভোগের আয়োজন করেন। শোভা ভোগ নিবেদন করিতে গেলেন। খিচুড়ি, দধি, মিষ্টান্ন ইত্যাদি আয়োজন ছিল। ভোগ গৃহদ্বার বন্ধ করিয়া নিবেদন করিতে হয়। শোভা ভিতরে; সুকুমারবাবু, তাঁহার ভ্রাতা সুরেন্দ্রবাবু (শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রচন্দ্র রাহা), শিশিরবাবু এবং পূর্বোক্ত দেবহরি দে বাহিরে অপেক্ষা করিতেছিলেন। সুকুমারবাবু ভাবিতেছিলেন, "বাবা গ্রহণ করিবেন কি করিবেন না শোভাই জানিবে, আমাদের জানিবার জো নাই। এমন সময় শোভা ভোগ নিবেদন করিয়া বাহিরে আসিলেন। ঊষা মা ভোগ সরাইতে ঘরে ঢুকিয়াই উচ্চৈঃস্বরে ডাকিয়া বলিলেন, "কাকা-বাবু, শীগ্‌গির ঘরে এসে দেখুন এসব কি!" দেখা গেল খিচুড়ীতে ভাজা মিশাইয়া কে যেন কতকটুকু খাইয়া গিয়াছেন, লবণের উপর একটি আঙুলের স্পষ্ট ছাপ, অন্নের উপর দক্ষিণ হস্তের একটি পরিষ্কার ছাপ, পাঁচটি আঙুলের দাগই স্পষ্ট মণিবন্ধের দিকে একটি পূরণ-চিহ্ন (×)। আর একটি নিবেদিত সামগ্রীর উপর চারিটি ছোট অঙ্গুলির অগ্রভাগের ছাপ।

স্বভাবতঃ অনেকেরই সন্দেহ হইয়াছিল দাগগুলি শোভার হাতেরই হইবে। পূরণচিহ্নটির অর্থ বুঝা যাইতেছিল না; আর হাতের যে দাগ ছিল তাহাও শোভার হাত হইতে বড় বলিয়া বোধ হইয়াছিল।

রাত্রিতে শোভা পূজা শেষ করিয়া আসিয়া বলিলেন, বাবাজী মহারাজ বলিয়া গেলেন, "যেখানে খাওয়ার চিহ্ন

ছিল সেখানের দ্রব্য আমি খাইয়াছি।" হাতের ছাপ স্বয়ং ঠাকুরের। ছোট্ট আঙ্গুলের চিহ্ন গোপালের হাতের ; গোপালও খাইয়াছেন।

ইহার পর হইতে প্রায় প্রত্যহ ভোগ দিলেই নিবেদিত দ্রব্যে গ্রহণের কোনও না কোনও -স্পষ্ট নিদর্শন দেখা যাইতে লাগিল। কদাচিৎ ইহার ব্যতিক্রম হইত। কয়েক দিন পরে-২৯শে ফাল্গুন তারিখে—উজানচর-নামক স্থানে বাবাজী মহারাজ শোভাকে বলেন যে তিনি তাঁহার দেওয়া ভোগ রোজই গ্রহণ করেন, ভোগে কোনও চিহ্ন না দেখিলে কেহ যেন এরূপ মনে না করেন যে, তিনি (বাবাজী মহারাজ) তাহা গ্রহণ করেন নাই।

উজানচরের নাম করিয়াছি। ইংরাজী ১৯৩৬ সনের জানুয়ারী মাসে সুকুমারবাবু বরকান্তার চাকুরী ছাড়িয়া ত্রিপুরা জিলার উজানচর নামক স্থানের উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক হইয়া যান। ইহার পূর্বের আরও দুইটি ঘটনা উল্লেখযোগ্য।

শোভার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার নাম সতু (শ্রীমান্ সুবিমল রাহা; বি. এ.)। তখন শ্রীমান্ কলেজে আই এ ক্লাসে পড়ে। ঐ সময়ের কিছু পূর্বে তাহার 'নাম' নিবার খুব আকাঙ্ক্ষা হয়। শোভা সে কথা গুরুকে বলায় তিনি বলেন, "তোমাকে যে কাগজে নাম লিখিয়া দিয়াছি, সেই কাগজখানি আসনে রাখিয়া তাহাতে যে নাম আছে সেই নাম একটি কাগজে

লিখিয়া সতুকে দিও।" ২৪শে ফাল্গুণ ঐ ভাবে সতুকে নাম দিবার দিন নির্দ্দিষ্ট ছিল। ঐ দিন রবিবার; উহা শোভার মৌনেরও দিন ছিল। সতু স্নান করিয়া আসিয়া গুরুজীর নির্দ্দেশমত নাম পাইল। উহার পরেই অত্যন্ত অপ্রত্যাশিত ভাবে শোভা মৌনভঙ্গ করিয়া বলিল, সবুজ কোথায় "সবুজকে ডাক, তাহাকেও নাম দিবার আদেশ হইয়াছে।" সবুজ (শ্রীমান স্থনির্ম্মল রাহা) শোভার অব্যবহিত ছোট ভাই। তাহার নাম নেওয়ার কোনও প্রস্তাব কেহ পূর্ব্বে শোনে নাই, কিন্তু দেখা গেল সে পূর্ব্বে স্নান করিয়া আসিয়াছে। সে বলিল পুর্ব রাত্রি হইতে তাহারও নাম নেওয়ার খুব আকাঙ্ক্ষা হইয়াছে, তাই কাহার প্রেরণায় জানে না ইতিমধ্যেই সে স্নান সারিয়া আসিয়াছে। অতঃপর সেও গুরুজীর নির্দ্দেশমত নাম পাইল।

ঐ দিনই উষা মায়ের ভগিনী কুমারী স্থমতি দেবীকেও কৃপা করার প্রস্তাব শোভার নিকট করা হয়। স্থমতি তখন ম্যাট্রিক ক্লাসের ছাত্রী। শোভা ঐ বিষয়ে গুরুর আদেশ চাহিলে তিনি বলেন, "যদি সে দীক্ষা চায়, তবে অমুক তিন জনের যে কোনও এক জন হইতে নিতে পারে। আর যদি নাম চায়, তবে এই আসন হইতে আমি দিতে পারি।" পরামর্শ করিয়া স্থমতির নাম নেওয়াই স্থির হয়। শোভা কাগজ কলম নিয়া বাবাজীর আসনের সম্মুখে বসিলে তিনি একটি নাম বলিয়া দেন, শোভা তাহা কাগজে লিখিয়া লন। এই নামটি সতু বা সবুজ যে নাম পাইয়াছিল তাহা হইতে ভিন্ন।

চার

স্থান উজানচর। ইং ১৯৩৬ সনের জানুয়ারী মাসের শেষভাগে সুকুমারবাবু এইখানে স্কুলের হেড্‌মাষ্টার হইয়া আসেন। এই স্কুলের স্থাপনকর্ত্তা এবং আরও কেহ কেহ ৺সন্তদাস বাবাজী মহারাজের শিষ্য ছিলেন। সেইজন্য তাঁহারা সুকুমারবাবুকে শ্রদ্ধার চক্ষে দেখিতেন। স্কুলটি ছিল শৃঙ্খলাহীন। সুকুমারবাবু উহাতে কিছু শৃঙ্খলাস্থাপন করেন, কিন্তু ঐ চাকরীটি তাঁহার মনঃপূত না হওয়াতে বেশীদিন ওখানে থাকেন নাই, মে মাসের মাঝামাঝি পুনরায় বরকান্তায় হেড্‌মাষ্টারের কাজে ফিরিয়া যান। সুকুমারবাবু যখন উজানচর যান, তখন শোভা সঙ্গে যান নাই, পরে গিয়াছিলেন। বস্তুতঃ সুকুমার বাবুর তথায় চারিমাস অবস্থানকালের মধ্যে শোভা ন্যূনাধিক দুই মাস সেখানে ছিলেন। হবিগঞ্জ ও বানিয়াচঙ্গেও কিছু দিনের জন্য এই সময়ে গিয়াছিলেন। এই তিন স্থানেই ভোগ-নিবেদনের অন্তে ভোগের দ্রব্য নানাপ্রকার গ্রহণচিহ্নে অঙ্কিত দেখা গিয়াছে। ১৭ই চৈত্র তারিখে শোভা বাবাজীকে জিজ্ঞাসা করেন, "আমি নিবেদন করিলে তুমি যেমন ভোগ গ্রহণ কর, অন্যে নিবেদন করিলে সেইরূপ কর কি?"

বাবাজী মহারাজ উত্তরে বলেন, "আমি সবাইকে দেখাও দেই, ভোগও গ্রহণ করি, যদি ডাকার মত ডাকিতে পারে।"

শোভা—আমিত তোমাকে তেমনভাবে ডাকি না।

বাবাজী—তুই ত আমার পাগলী মা।

শোভা—তারাও ত তোমার ছেলে।

বাবাজী—সন্তান যখন ছোট থাকে তখন বাপ-মা তাহাদিগকে নানারূপ সুশিক্ষা দেন। তাঁহারা মরিয়া গেলেও আশা করেন সন্তানেরা তাঁহাদের মত বা তাঁহাদের চেয়েও ভাল হউক। শিষ্যেরা যখন অজ্ঞান ছিল তখন আমি তাহাদিগকে জ্ঞান দিয়াছি। এখন তাহারা সেইভাবে চলিলেই ত পারে।

এই প্রসঙ্গে এখানে আরও কয়েকটি কথা বলা আবশ্যক। শোভা মা যখন কলিকাতায় আমার বাড়ীতে ছিলেন তখন তিনি ভোগ নিবেদন করিলে কোন দিন দেখা গিয়াছে অন্নপাত্রে অন্ন (শুধু অন্নই—অন্য জিনিস নহে) নিঃশেষ হইয়াছে। কোনও দিন দা'লের পাত্রে, কোনও দিন পায়সের পাত্রে কিছুই নাই। কোনও দিন কতকগুলি ভাজা লুচির অভ্যন্তরে আলুভাজা ঢুকিয়া রহিয়াছে, অথচ লুচির কোনও স্থান কাটা বা ফাটা দেখা যায় নাই। কোনও দিন অন্নপাত্রে অন্ন দা'ল ও অন্য উপকরণসহ মাখা হইয়া আছে। আমার বাড়ীর যে ঘরে ঠাকুরদের ছবি ছিলেন, তাহাতে কোনও নর্দ্দামা নাই। ভোগের পরে সে ঘরে বা বাহিরের বারান্দায় কখনও এক ফোঁটা জলের চিহ্ন দেখা যাইত না, যদ্দারা অনুমান করা যাইত যে, কেহ ভোগ মাখিয়া হাত ধুইয়াছে। আমরা অবিশ্বাসী, সেই জন্য সর্ব্বদা সতর্কভাবে পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে এই

সকল বিষয়ে দৃষ্টি রাখিতাম। সুকুমারবাবুর ডায়েরীতেও এইরূপ অবিশ্বাস বা সন্দেহের দ্বারা প্রণোদিত নানাবিধ অনুসন্ধানের উল্লেখ আছে। তাঁহার স্ত্রীও অনুসন্ধান কম করেন নাই। উজানচরেই এক দিন তাঁহার এক পরীক্ষার কথা সুকুমারবাবুর ডায়েরীতে লেখা আছে। ১৩ই বৈশাখ তারিখে শোভার ডান হাতের অঙ্গুষ্ঠ কাটিয়া গিয়াছিল, একটু বেশী রকমই কাটিয়াছিল। তাহার দরুণ কয়েক দিন তিনি নিজ হাতে ভাত মুখে দিতে পারিতেন না। তাঁহার মা সাদা কাপড় দিয়া আঙুলটি ব্যাণ্ডেজ করিয়া দিতেন, এবং এজন্য যতটুকু স্থান বাঁধা দরকার তাহা হইতে অনেক বেশী স্থান ব্যাপিয়া ব্যাণ্ডেজ করিতেন। শোভা মা ঐ ব্যাণ্ডেজ-করা হাত নিয়াই ভোগ নিবেদন করিতে যাইতেন। নিবেদনের অন্তে দেখা যাইত ভোগের অন্ন দা'ল ইত্যাদি সব একসঙ্গে মাখা হইয়া রহিয়াছে কিংবা তাহাতে অন্য এরূপ চিহ্ন আছে যাহাতে বুঝা যায় কাহারও হাত দিয়া তাহা ভাল করিয়াই ঘাটা হইয়াছে। শোভা মা ভোগ দিয়া বাহিরে আসিলেই তাঁহার মা তাঁহার হাতের ব্যাণ্ডেজে ভোগের দ্রব্য স্পর্শ করিবার কোনও চিহ্ন আছে কি না তাহা ভালরূপে পরীক্ষা করিয়া দেখিতেন! এই পরীক্ষার কথা শোভা মা একদিন আমার স্ত্রীকে বলিতে বলিতে হাসিয়া কুটপাট হইয়াছিলেন।

ভোগনিবেদনের পর এরূপ দেখা গিয়াছে যে, বাবাজীর তৈলচিত্রে তাঁহার মুখের কাছে কতটুকু ভোগ লাগিয়া আছে।

আমার বাড়ীতেও ইহা কয়েকবার দেখা গিয়াছে। একদিন আমার ঠাকুরঘরে ভোগ নিবেদনের পর আমার গুরুদেবের একখানি ফটোতে এবং শ্রীশ্রীদুর্গার একখানি ছবিতেও আয়নার উপরে মুখের কাছে ভোগের অংশ লাগিয়া থাকিতে দেখা গিয়াছে; ছবি দুই খানি দেয়ালে এত উচ্চস্থানে ঝুলান যে, শোভা কেন, তদপেক্ষা দীর্ঘকায় ব্যক্তিরও হাত দিয়া ছবির মুখ পর্য্যন্ত স্পর্শ করা একেবারেই অসম্ভব। সুকুমারবাবুর গৃহে এরূপ ঘটনাও হইয়াছে যে, এক ঘরে ভোগ নিবেদন করার পর অন্য এক ঘরে স্থিত ঠাকুরের ছবির মুখে ভোগাংশ লাগিয়া থাকিতে দেখা গিয়াছে।

আরও একটি কথা এই প্রসঙ্গে বলা যাইতে পারে। আমার বাড়ীতে একদিন কেহ এইরূপ স্থূলভাবে ভোগগ্রহণ সম্বন্ধে শোভাকে প্রশ্ন করিয়াছিলেন। ডক্টর মহেন্দ্রনাথ সরকার সেই সময়ে উপস্থিত ছিলেন; তিনিই প্রশ্ন করিয়াছিলেন কিনা ঠিক বলিতে পারি না। মা উত্তর দিয়াছিলেন, গীতাতেও ত আছে ভগবান্‌কে পত্র-পুষ্প-ফল ইত্যাদি যে যাহা ভক্তি-পূর্ব্বক দেয়, তিনি তাহা গ্রহণ করেন।"

প্রশ্ন—তিনি কি স্থূলবস্তু গ্রহণ করেন? তিনি ভক্তি-টুকুই গ্রহণ করেন।

শোভা—গীতায় তাহাই আছে কি? তিনি যদি ভক্তি-ভিন্ন কিছুই গ্রহণ না করিতেন, তবে সেরূপ কথা স্পষ্ট

বলিতে কি বাধা ছিল? পত্রপুষ্পফলাদি গ্রহণ করেন বলিবেন কেন?

শোভার উত্তরে ডক্টর মহেন্দ্রনাথ সরকার "বাঃ বাঃ" বলিয়া বিস্ময় প্রকাশ করিয়াছিলেন বলিয়া মনে পড়ে।

উজানচরে আসিয়া পূজা করিবার সময় শোভার মধ্যে নানা দেবতার, বিশেষতঃ কৃষ্ণের, বিষ্ণুর, কালীর ও নাড়ূগোপালের, অঙ্গভঙ্গী ঘন ঘন দেখা যাইতে লাগিল। একদিন তাঁহার হাতে এরূপ মুদ্রা প্রকাশ পায় যাহাতে মনে হইয়াছিল যেন শোভা কাহাকেও অভ্যর্থনা করিতেছেন। বাহ্যজ্ঞান হইলে তিনি বলেন, কোনও মহাপুরুষ আসিয়াছিলেন। একদিনকার হাতের ভঙ্গীর ব্যাখ্যায় প্রকাশ পাইল গোপাল শোভার হাতের উপর নৃত্য করিতেছিলেন। একদিন এক দেবতা আসিয়াছিলেন, ঠাকুর না কি শোভাকে দিয়া সম্পূর্ণ এক নূতন পদ্ধতিতে তাঁহার পূজা করান। তাঁহার জন্য আসনও স্বতন্ত্র দিতে হইয়াছিল। ঐ দেবতা ত্রিনয়ন বলিয়া শোভার বোধ হইয়াছিল। আর একদিন না কি ব্রহ্মা আসিয়াছিলেন, ঠাকুর তাঁহাকেও শোভার দ্বারা স্বতন্ত্র আসন দেওয়ান এবং স্তবপাঠ করাইয়া তাঁহার নিকট প্রার্থনা করান। পিতার প্রশ্নের উত্তরে শোভা বলেন, সকল দেবতাই ঠাকুরের (শ্রীকৃষ্ণের) ভিন্ন ভিন্ন মূর্ত্তি। কিন্তু প্রত্যেকের বিভূতি ভিন্ন, স্তব-পূজাও ভিন্ন। স্বয়ং ঠাকুর এই সব স্তব-পূজা-প্রভৃতি শোভাকে শিখাইয়া দেন। একদিন বেলা দশটায় বাবাজী মহারাজকে

নিবেদন করিবার উদ্দেশ্যে কিছু দুধ লইয়া ঘরে ঢুকিতেই শোভা এবং সুকুমারবাবুও দেখেন আসনের উপরে আস্তরণের মধ্যস্থলে কিয়দংশ উঁচু হইয়া যেন কোঁচান রহিয়াছে। শোভা অগ্রসর হইয়া লক্ষ্য করিয়া বলিলেন একটি শালগ্রাম উহার নীচে আসিয়াছেন। সুকুমারবাবু কিছুই দেখিলেন না। কিছুক্ষণ পরে শালগ্রাম অন্তর্হিত হন।

অঙ্গভঙ্গী—সম্বন্ধে শোভা প্রায়ই কিছু বলিতে পারিতেন না। প্রশ্ন করিলে বলিতেন, "ঠাকুরজী আমাকে কখন কি সাজান বলিতে পারি না। কারণ আমি ও ঠাকুর ভিন্ন এমন জ্ঞান তখন আমার থাকে না; আমি যে তখন কোথায় থাকি সে জ্ঞানও আমার থাকে না। কিছুক্ষণ পরে নিজেকে পৃথক বলিয়া বুঝিতে পারি। তখন ঠাকুরজীকেও দেখি, বাবাজীকেও দেখি।"

২৬শে চৈত্র তারিখে শোভা তাঁহার পিতাকে বলেন, তোমার এখানে রাধারাণীর যে ছবি আছে, তার চেয়ে রাধারাণীর চেহারা অনেক সুন্দর।

সুকুমারবাবু—আচ্ছা ঠাকুরের হাতে কি কোনও অলঙ্কার আছে?

শোভা—হাঁ, হাতপদ্ম আছে। তাহার কব্‌জীর নীচে (পূরণ চিহ্নের মত চিহ্ন দেখাইয়া) এই রকম একটা ক্লিপের মত আছে।

এতদিনে সুকুমারবাবু বুঝিলেন ভোগের অন্নের উপর

স্পর্শকারী হস্তের মণিবন্ধ যেস্থানে স্পৃষ্ট হওয়ার সম্ভাবনা তথায় কেন একটা পূরণ চিহ্নের মত চিহ্ন দেখা যায়। ঐরূপ চিহ্ন আমার বাড়ীতে শোভা মা কর্ত্তৃক নিবেদিত ভোগের উপরেও দেখা গিয়াছে।

ইহার পরে ঠাকুরের আসনের উপর স্পষ্ট পদচিহ্ন দেখা যাইত।

১৩৪৩ সালের ১লা বৈশাখ হইতে আর একটি অবস্থার বিকাশ হয়। ঐদিন দেখা যায় শোভা ধ্যানাবস্থায় নিজের পা টিপিতেছেন, নিজের পায়েই অঞ্জলি দিতেছেন, নিজের পা হইতেই লইয়া যেন চরণামৃত পান করিতেছেন। ঐদিন নিজের পায়ের কাছেও আরতি করেন। বাহ্য জ্ঞান ফিরিয়া আসিলে তাঁহাকে প্রশ্ন করা হইল, "অদ্যকার পূজায় কোনও বিশেষত্ব ছিল কি?"

শোভা উত্তর দিলেন,—"কিছু না। অন্য দিনের মতই ঠাকুরের পা টিপিয়া দিয়াছি, অঞ্জলি দিয়াছি, আরতি করিয়াছি, চরণামৃত খাইয়াছি।"

কোনও কোনও দিন তাঁহাকে আসনের উপর বংশীধারী শ্রীকৃষ্ণের ভঙ্গীতে বসিয়া থাকিতে দেখা গিয়াছে। মুখে মৃদু মৃদু হাসি, কিন্তু বাহ্যজ্ঞান রহিত। পূজার অন্তে শোভা বিশেষ কিছু বলিতে পারেন নাই। এখন হইতে ঐরকম অবস্থা হইলে শোভার পিতা ও মাতা তাঁহাকে ফল ও ধূপ-দীপ দিয়া অর্চ্চনা করিতে লাগিলেন, যদিও তাঁহাদের প্রশ্নের

ও অনুসন্ধানের অন্ত ছিল না।

একদিন (১২ই বৈশাখ) শোভা পিতাকে বলেন, বাবাজী মহারাজ এখন তাঁহাকে দীক্ষার প্রণালী শিক্ষা দিতেছেন। কি মন্ত্র বলিয়া কণ্ঠে মালা বাঁধিতে হয়, দীক্ষার কি মন্ত্র, প্রাণ-প্রতিষ্ঠার কি মন্ত্র সে সবই শোভা শিখিয়াছেন বলিলেন। তদ্‌ভিন্ন শোভা ইহাও বলেন যে, যদিও তাঁহার মাতাপিতা যে মন্ত্র পাইয়াছেন তাহা তাঁহারা কখনও শোভাকে বলেন নাই তথাপি তিনি তাহা জানেন, কেন না বাবাজী মহারাজ তাঁহাকে তাহা বলিয়াছেন। এই বলিয়া তিনি মন্ত্রটি তাঁহাদের নিকট প্রকাশ করেন। ঐ মন্ত্রের বীজটি বাবাজী মহারাজ যে খুব জোর দিয়া উচ্চারণ করিয়াছিলেন এবং "ব"-ফলা ও আ-কার যুক্ত একটি শব্দকে পশ্চিমা ধরণে "ওয়া"-যুক্তবৎ উচ্চারণ করিয়াছিলেন ইহাও বলেন। শোভা এই শোষোক্তরূপ উচ্চারণের কারণ বুঝিতে পারেন নাই বলিয়া পিতাকে তাহা জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন। ঐ শব্দটি সুকুমারবাবুর ডায়েরীতে লেখা হইয়াছে; কিন্তু মন্ত্র বা মন্ত্রাংশ সর্ব্বসাধারণের নিকট প্রকাশ্য নহে বলিয়া এখানে ইঙ্গিতে মাত্র বলা হইল।

শোভা ঐদিন ইহাও বলেন, এখন যাঁহারা বাবাজী মহারাজ হইতে দীক্ষা নিবেন তাঁহারা নিজেরাই মালা গোপীচন্দন ইত্যাদি নিয়া আসিবেন বাবাজী এইরূপ আদেশ করিয়াছেন। ইহা হইতে বুঝা যায় এ পর্য্যন্ত শোভা যাহাদিগকে নাম দিয়াছেন এবং ইহার পরেও (অন্ততঃ তাঁহার স্বয়ং গুরু হইবার যোগ্যতা না হওয়া পর্য্যন্ত) যাঁহারা তাহা হইতে নাম বা

দীক্ষা পাইবেন, তাঁহারা প্রকৃতপক্ষে সন্তদাস বাবাজী হইতেই তাহা পাইয়াছেন বা পাইবেন। শোভা কেবল প্রাপ্তির দ্বারস্বরূপ বুঝিতে হইবে।

ঐ দিনই শোভাকে বলা হইয়াছিল তাঁহার সহিত বাবাজী মহারাজ যে লীলা করিতেছেন তাহা বৃন্দাবন আশ্রমে শ্রীযুক্ত ধনঞ্জয় দাস বাবাজীকে লেখা উচিত কিনা তদ্বিষয়ে শোভা যেন বাবাজী মহারাজকে জিজ্ঞাসা করেন। বিকালে ঠাকুরের যথারীতি নিদ্রাভঙ্গ করাইয়া "শীতল" (ভোগ) দেওয়ার পর শোভা আসিয়া বলিলেন, বাবাজী মহারাজ আদেশ করিয়াছেন, "এই সব এখন ধনঞ্জয় দাসজীকে জানাইবার দরকার নাই।"

২২শে বৈশাখ রাত্রিতে শোভাকে বংশীধর শ্রীকৃষ্ণের ভঙ্গীতে পূজার আসনে উপবিষ্ট দেখা যায়। পরে তিনি হঠাৎ বরাভয়হস্তা ৺কালীর ভঙ্গীতে দণ্ডায়মান হন। তারপর ঐ অবস্থায়ই, তরবারী দ্বারা কাহাকেও আঘাত করার ভঙ্গীতে তাঁহাকে হস্তসঞ্চালন করিতে দেখা যায়। পূজার অন্তে বাহ্য ভাব আসিলে তিনি পিতার প্রশ্নের উত্তরে বলেন, আজ তিনটি নূতন বিষয় শিখিলাম, তাহা তোমাদিগকে বলিব না।

প্রশ্ন। কে শিখাইয়াছে ?

উত্তর। বলিতে পারি না। এখন ত কাহাকেও দেখি না। মনে পড়ে একটা অসুর বাধা দিতে আসিয়াছিল, মা কালী তাহাকে তরোয়াল দিয়া আঘাত করিয়াছেন।

প্রঃ। তুই কোথায় ছিলি ?

উঃ। কে যে কোথায় তা কি আর জানি।

২৪শে বৈশাখ প্রাতে পূজা সারিয়া শোভা বলেন "বাবা, দেখ আমার হাত কেমন ফুলিয়া উঠিয়াছে।"

পিতা। কেন এমন হইল ?

শোভা। আজ গোপাল হাতে একটা ছড়ি নিয়া খুব ছুটাছুটি করিতেছিল ; হঠাৎ ছড়িটা ঠাকুরের গায়ে লাগিয়া গিয়াছিল।

পিতা। ঠাকুরজীর গায়ে যে লাগিয়াছিল তাহা তুমি দেখিয়াছিলে ?

শোভা। না দেখি নাই। আমি আমাকে, ঠাকুরজীকে বা বাবাজী মহারাজকে—কাহাকেও দেখি নাই। কিন্তু ছড়িটা যে ঠাকুরজীর গায়ে লাগিল এবং তাহাতে ঠাকুরজীর হাত ফুলিয়া উঠিল ইহা আমি পরিষ্কার টের পাইলাম। আচ্ছা, বাবা, ইহাতে আমার হাত ফুলিয়া উঠিল কেন ?

সুকুমারবাবু কোনও উত্তর দিলেন না ; কি উত্তরই বা তিনি দিতে পারিতেন ? তিনি সুধু ভাবিতে লাগিলেন, "শোভা যখন শ্রীকৃষ্ণের ভঙ্গীতে অবস্থান করে, তখন কি সে তাঁহার সহিত একদেহ হইয়া যায় ?

দুই দিন পরে শোভা বলেন, "পূজা করিতে বসিবার সময় দেখি ৺রাধাকৃষ্ণ দাঁড়াইয়া আছেন. আর বাবাজী মহারাজ

দাঁড়াইয়া আছেন। তার পর আর কিছু দেখি না; শুধু অনুভব করি আমি আর শ্রীকৃষ্ণ যেন এক হইয়া যাই।" ঐদিনও পূজার সময় শোভাতে প্রথমে শ্রীকৃষ্ণের অঙ্গভঙ্গী এবং পরে ৺কালীর অঙ্গভঙ্গী ব্যক্ত হইয়াছিল।

শোভার সাধন অবস্থায় পুনঃ পুনঃ ৺কালী দর্শন এবং তাঁহার স্বদেহে ৺কালীর অঙ্গভঙ্গীর প্রকাশ সুকুমারবাবুর ডায়েরীতে পুনঃ পুনঃ উল্লিখিত হইয়াছে। শেষোক্ত ব্যাপার যে ৺কালীর সহিত একত্ব অনুভবের ফল তাহাও উপরিলিখিত উক্তি হইতে স্পষ্টই বুঝা যায়। বৈষ্ণব সাধনায় ইহা একটি অসাধারণ অনুভূতিই বলিতে হইবে। ইহার বিশিষ্ট কারণ আশা করি পরে যথাস্থানে প্রকাশ পাইবে। এখানে অবশ্য একথাও বলা আবশ্যক যে, ৺কালী, দুর্গা প্রভৃতি দেবতার প্রতি গৌড়ীয় বৈষ্ণব সম্প্রদায়ে সাধারণত; যেরূপ বিদ্বেষভাব লক্ষিত হয়, বাবাজী মহারাজের সম্প্রদায়ে তাহা বিরল। শিষ্যগণের নিকট লিখিত তাঁহার অনেকগুলি পত্র "পত্রাবলী" নামে দুই খণ্ডে প্রকাশিত হইয়াছে। তাহাতে এই বিষয়ে সবিশেষ উদারতার প্রমাণ আছে। কৌতূহলী পাঠককে উহা পাঠ করিতে অনুরোধ করি। সম্প্রদায়-নির্বিবশেষে সকলেই ঐ "পত্রাবলী" হইতে আরও বহুবিধ মূল্যবান উপদেশ প্রাপ্ত হইবেন। আরও একটি কথা বোধ করি এখানে বলা যাইতে পারে। তাহা এই: শোভাকে ইতিমধ্যেই তাঁহার

গুরুজী যে ভূমিতে উন্নীত করিয়াছেন তথায় সাম্প্রদায়িকতার স্থান নাই। তাই তাঁহার সাধনকালে নানা দেবদেবী এমন কি স্বয়ং 'ব্রহ্মা' ও 'ত্রিনয়ন' (শিব) তাঁহার নিকট আবির্ভূত হইয়া পূজাগ্রহণ করেন। সাম্প্রদায়িক গোঁড়াদিগের মধ্যে কাহার সম্বন্ধে এ কথা বলা যায়? বস্তুতঃ গোঁড়ামি আধ্যাত্মিক উন্নতির অনুকূলও নহে, লক্ষণ ত নহেই।

———

পাঁচ

জ্যৈষ্ঠ মাসের দ্বিতীয় সপ্তাহে শোভা উজানচর হইতে হবিগঞ্জ যান। ঐ স্থানে তাঁহার এক জেঠা মহাশয় (শ্রীযুক্ত শচীন্দ্র রাহা) আছেন। কয়েক দিন পরে তিনি ঐ স্থান হইতে বানিয়াচঙ্গ গ্রামে গমন করেন। এই উভয় স্থানেই শোভা-কর্তৃক ভোগনিবেদনের পর তাহাতে ঠাকুরজী বা বাবাজী মহারাজের বা উভয়েরই গ্রহণচিহ্ন প্রতিদিন, এমন কি প্রায় প্রতি বেলায়ই, দেখা যাইত। সন্ধ্যাহ্নিকাদির সময় দেবতার আবেশও তাঁহার অঙ্গভঙ্গীতে প্রকাশ পাইত। গ্রন্থের কলেবরবৃদ্ধির ভয়ে এই সকলের সবিস্তার বিবরণ দেওয়া হইল না। ১৮ই জ্যৈষ্ঠ তারিখে বানিয়াচঙ্গে সুকুমারবাবু তাঁহার একটা ব্যক্তিগত ব্যাপার-সম্পর্কে বাবাজী মহারাজের নিকট কিছু প্রার্থনা জানাইতে শোভাকে অনুরোধ করিয়াছিলেন। শোভা ঐ প্রার্থনা গুরুকে নিবেদন করেন এবং পরে আসিয়া পিতাকে বলেন, "বাবাজী মহারাজ বলিলেন, এত অস্থির হইলে চলে না; একটু ধৈর্য্য ধরিতে ও নির্ভর করিতে শিখিতে হয়।"

এই পরিচ্ছেদের নিম্নোক্ত অংশ শ্রীযুক্ত শিশিরবাবুর ডায়েরী অবলম্বনে লিখিত।

বানিয়াচঙ্গ হইতে শোভা হবিগঞ্জ ফিরিবার পর ১২ই

আষাঢ় তারিখে শিশিরবাবু তাঁহাকে বলেন, "গীতার তৃতীয় অধ্যায়ের ৩৩ ও ৩৪ সংখ্যক শ্লোকদ্বয়ের অর্থ সম্বন্ধে একটু সন্দেহ হইয়াছে, বাবাকে বলিও ইহার মীমাংসা করিয়া দিতে।" ইহার উত্তরে শোভা বলেন, বাবাজী প্রয়োজন-বোধে যাহা বলেন, তাহার অধিক আমি তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিতে পারিব না।" কিন্তু পরদিনই আহ্নিকান্তে শোভা বলেন, "গীতার শ্লোকসম্বন্ধে বাবা উত্তর দিয়াছেন, 'ওর (অর্থাৎ শিশিরবাবুর) নিজের মনেই অর্থের উদয় হইয়াছে।' সত্য-সত্যই শিশিরবাবু ইতিমধ্যে নিজ মনেই সন্দেহটির একটা মীমাংসা করিয়া লইয়াছিলেন।

হবিগঞ্জ হইতে শোভা কুমিল্লাতে আসেন। ঐ স্থানেও তাঁহার এক জেঠা মহাশয় (শ্রীযুক্ত বরদাকান্ত রাহা) থাকেন। ১৯শে আষাঢ় রাত্রিতে শোভা বলেন, "কাল জেঠা মহাশয়ের দীক্ষা হইলে ভাল হয়।" এই স্থানে বলা আবশ্যক যে, বরদাবাবু স্বয়ং সন্তদাস বাবাজীর নিকট দীক্ষাপ্রার্থী হইয়াছিলেন এবং তিনিও দীক্ষা দিতে সম্মত হইয়াছিলেন। কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে বাবাজী দেহে থাকা কালে বরদাবাবুর দীক্ষালাভ ঘটিয়া উঠে নাই। পরদিন ২০শে আষাঢ় প্রাতে আহ্নিক সারিয়া আসিয়া শোভা বলিলেন, বাবাজী মহারাজ বলিয়াছেন, জেঠামহাশয় ও জেঠিমার দীক্ষা হইবে।" ইহাতে শিশিরবাবু জিজ্ঞাসা করেন, "মন্ত্রের কি হইবে?"

শোভা। মহারাজজী বলিয়া দিবেন এবং আমি লিখিয়া লইব।

এই বলিয়া শোভা কাগজ ও কলম লইয়া ঠাকুরঘরে গেলেন এবং কিয়ৎকাল পরে বাহিরে আসিয়া বলিলেন "মন্ত্র লেখা হইয়াছে।"

শিশিরবাবু। বাবাজী মহারাজ কিভাবে মন্ত্র বলিলেন ?

শোভা। তিনি সামনে দাঁড়াইয়া বলিলেন এবং আমি লিখিয়া লইলাম।......আমি বাবাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম, মন্ত্র ত গুরু কাণে দেন এবং তাতেই নাকি গুরুশক্তি শিষ্যে সঞ্চারিত হয়। ইহাতে বাবাজী মহারাজ বলিলেন, এই লেখার ভিতর দিয়াই সেই শক্তি সঞ্চারিত হইবে।

তারপর কণ্ঠি, জপের মালা, কাপড় সব গুছাইয়া শোভার হাতে দেওয়া হইল। শোভা উহা নিয়া ঘরে গিয়া এমন ভাব করিলেন যেন কণ্ঠি ইত্যাদি গুরুর পায়ে স্পর্শ করাইয়া শোধন করিয়া লইতেছেন। পরে প্রায় পঁচিশ মিনিট কাল ধরিয়া তাঁহার সহিত কথাবার্ত্তা বলিবার ভাব দেখাইলেন। ঐ সময়ে শোভার মুখে এক অপূর্ব্ব হাসির দীপ্তি ব্যক্ত হইয়াছিল। ইহার পর তিনি বরদাবাবু ও তাঁহার স্ত্রীকে কাগজ হইতে মন্ত্রটি পাঁচবার পাঠ করিতে বলিয়া যথানিয়মে দীক্ষা দিয়াছিলেন।

ছয়

উজানচরের কর্ম্ম সুকুমারবাবুর ভাল লাগে নাই; তাই তিনি তাহা ছাড়িয়া দিয়া বরকান্তা স্কুলে ফিরিয়া আসেন। শোভাও কুমিল্লা হইতে ২৭শে আষাঢ় তারিখে তথায় আসেন। এখানেও বংশীধর ৺কৃষ্ণের ভঙ্গীতে এবং ৺কালীর ভঙ্গীতে তাঁহাদের আবেশ ব্যক্ত হইতে লাগিল। ভোগনিবেদনেও পূর্ববৎ নানাবিধ গ্রহণচিহ্ন প্রত্যেক বারই প্রকাশ পাইতে লাগিল।

৩১শে আষাঢ় (ইং ১৫।৭।৩৬) প্রাতে শোভা শিশিরবাবুকে বলেন যে, কয়েকদিন যাবৎ তাঁহার যেন কেমন একরকম বোধ হইতেছে। তিনি যে কোথায় থাকেন তাহা বলিতে পারেন না; গাছপালা, বাড়ীঘর, লোকজনের যাতায়াত সবই যেন তাঁহার স্বপ্নবৎ মনে হইতেছে। পরদিন রাত্রিতে আহ্নিক শেষ করিয়া আসিয়া তিনি শিশিরবাবুকে বলেন, "দেখিলাম ঐ গাছটি হঠাৎ যেন দিব্য আলোকে উজ্জ্বল হইয়া উঠিল এবং তার মধ্যে শ্রীকৃষ্ণকেও দেখিলাম। আর দূরের ঐ গাছটা মোটেই দূরে মনে হইতেছিল না, বরং মনে হইতেছিল ওটা অতি কাছে। শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন, এই যে গাছ দেখিতেছ ইহাও আমারই অংশ। পরক্ষণে আর কিছুই দেখা গেল না।"

১১ই শ্রাবণ আর একটা ভঙ্গীর বিকাশ হয়। রাত্রিতে একটা

ভাব আসে ; ঐ ভাবে আবিষ্ট অবস্থায় শোভা উঠিয়া দাঁড়ান এবং হাত দুইটি কোমরের কাছে তির্য্যগ্ ভাবে রাখেন। হবিগঞ্জে ও উজানচরেও এই ভাব এক একদিন দেখা গিয়াছিল। উহার পর তিনি যে আসনে দাঁড়াইয়া ঐরূপ ভাবস্থ হইয়াছিলেন তাহাতে স্পষ্ট পদচিহ্ন দেখা গিয়াছিল ; আজও তাহা দৃষ্ট হইল—সাদা চাদরের উপর গোপীচন্দন-মাখা পায়ের চিহ্ন। সুকুমারবাবু তৎক্ষণাৎ শোভার পায়ের মাপের সহিত ঐ পদ-চিহ্নের তুলনা করিয়া দেখিলেন উহা দৈর্ঘ্যে এক ইঞ্চি বড়। পরদিন প্রাতেও দুইবার শোভার পায়ের মাপের সঙ্গে পদচিহ্নের মাপ মিলাইয়া পূর্ব্ব দিনের মতই পরিমাণে প্রভেদ দেখিতে পাইলেন। এইদিন রাত্রিতে শোভা বলিলেন, "বাবাজী মহারাজ বলিয়াছেন—পায়ের ছাপে রক্ত চন্দন মাখিয়া যেন বাঁধাইয়া রাখা হয়।" শিশিরবাবুর স্মরণ হইল বাবাজী স্থূলদেহে পদচিহ্ন দিবার সময় রক্তচন্দনেই দিতেন।

১৫ই শ্রাবণ হালিয়াকান্দি-নিবাসী হেমেন্দ্রচন্দ্র সাহার দীক্ষা হয়। মন্ত্রপ্রাপ্তি ও দীক্ষার সকল কার্য্যই বরদাবাবুর দীক্ষার মত হয়। পরদিন শোভা কুমিল্লা আসিয়া শ্রীযুক্ত (অধুনা পরলোকগত) বাবু প্রিয়নাথ চক্রবর্ত্তীর বাসায় উঠেন এবং তথায় ভোগ হয়। প্রিয়নাথবাবু ৺ভোলানন্দ গিরি মহারাজের শিষ্য ছিলেন। ভোগনিবেদনের পর দেখা গেল অন্নের উপরে রক্তচন্দনমাখা হস্তাঙ্গুলির দাগ। শোভার হাতে ভোগনিবেদনের পূর্বে বা পরে কখনও রক্তচন্দনের দাগ ছিল না। অনেকেই

অনুমান করিলেন শোভা যে নিজে প্রসাদে হাত দেন না ইহার প্রমাণ ঐ ভাবে ৺ঠাকুরজী দিয়ে গেলেন। শোভাকে মুখে কিছু জিজ্ঞাসা করা গেল না; কেন না ঐ দিনটি ছিল তাঁহার মৌনের দিন। এই ঘটনার বিবরণ দিয়া সুকুমারবাবু ডায়েরীতে লিখিতেছেন,—আমি কিছু অধৈর্য-প্রকৃতির লোক। প্রসাদগ্রহণ করিয়া উঠিয়াই আজ ৺ঠাকুরজী কি বলিয়াছেন তাহা জানিবার জন্য শোভার কাছে কাগজ-কলম দিলাম। শোভা লিখিল, "গিরি মহারাজ বলিলেন, 'দেখ্ প্রিয়নাথ আমার সেবা-পূজা ঠিক মত করে না; তাকে বলিস্ আমার দেওয়া জপটা যেন করে।' বাবাজী মহারাজ বল্লেন 'আজ গিরি থালাতে ভাত খাইয়াছে -তাতে চিহ্ন আছে।' বাবাজী আরও বল্লেন, 'মহাপুরুষদের নিকট হইতে নাম নিয়া অবহেলা করিলে কল্যাণ হয় না।"

২৫শে শ্রাবণ, জন্মাষ্টমীর উপবাস। স্থান—বরকান্তা। ছুপুরবেলা কথাপ্রসঙ্গে শোভা বলিলেন সেদিন তিনি বদরিকাশ্রম গিয়াছিলেন। ৺ঠাকুরজী ও মহারাজ ছুই জনে ছুই হাত ধরিয়া তাঁহাকে নিয়াছিলেন। মন্দিরে কোনও প্রস্তরমূর্ত্তি তিনি দেখেন নাই; সাক্ষাৎ চতুর্ভুর্জ নারায়ণকে দেখিয়াছিলেন। ইনি মাঝে মাঝে তাঁহার কাছে আসেন। ফিরিবার সময় শোভা হরিদ্বারে ব্রহ্মকুণ্ডে স্নানও করিয়াছেন। শোভা পিতার নিকট বদরিকাশ্রমের বর্ণনাও দিয়াছিলেন।

ঐ দিন রায় বাহাতুর শ্রীযুক্ত খগেন্দ্রনাথ মিত্র-প্রণীত 'প্রেমের ঠাকুর' নিবন্ধ হইতে সুকুমারবাবু কিয়দংশ শোভাকে

পড়িয়া শুনাইতেছিলেন। শুনিতে শুনিতে শোভা সমাধিস্থা হন এবং ১৫।২০ মিনিট ঐ ভাবে ছিলেন।

২৮শে শ্রাবণ রাত্রিতে শোভা বলেন, "বাবাজী মহারাজ বলিয়াছেন, 'তোর বাবাকে বলিস্ আমাকে যেন একটা রূপার ছড়ি করিয়া দেয়। আমার স্থূলদেহ-সৎকারের সময় আমার লাঠিটা দেয় নাই।"

ইহার উত্তরে শোভা বলেন—"কেন, এই ত তোমার হাতে লাঠি রহিয়াছে"।

বাবাজী। এটা ভাঙ্গা।

শোভা লাঠিটা ভাঙ্গাই দেখেন। কিন্তু বলেন, "বাবা এখন পারবে না, হাতে টাকা নাই।"

বাবাজী। তোর মার কাছে আমার কয়েকটা টাকা আছে। তোর বাবাকে আর কিছু দিতে বলিস্। তবেই ছড়িটা হ'য়ে যাবে।

ছড়িটা কত বড় হইবে তাহাও বাবাজী শোভাকে দেখাইয়া দেন।

প্রকৃত পক্ষে শোভার মাতার হাতে বাবাজীর জন্য উদ্দিষ্ট কোনও টাকা ছিল না; কিন্তু ঠাকুরজীর নামে তুলিয়া রাখা কয়েকটি টাকা ছিল। সুকুমারবাবু ডায়েরীতে মন্তব্য করিয়াছেন, "বাবা বোধ করি ঐ ভাবে বুঝাইয়া দিলেন যে, তিনি ও ঠাকুরজী এক।"

বাবাজীর আদিষ্ট রূপার ছড়িটি ২১শে ভাদ্র তারিখে তাঁহার ছবির কাছে দেওয়া হয়। ঐ সময় শোভা সমাধিস্থা হইয়াছিলেন। বাহ্যজ্ঞান হইলে তিনি প্রকাশ করেন—"বাবাজী বলিলেন, ভারী সুন্দর হইয়াছে।"

উহার পূর্ব্বে ভাদ্র মাসেই পূর্ব্ববৎ আবেশগুলির সঙ্গে নূতন কয়েকটি আবেশ দেখা যায়। একটি প্রথমে বুঝা যায় নাই, পরে প্রকাশ পাইয়াছিল উহা ৺গায়ত্রীর আবেশ। একটি আবেশ ৺বীণাপাণির। তৃতীয় আবেশ ৺নাড়ু গোপালের। ১০ই ৺কালীর আবেশ হয়; কিন্তু বরাভয়হস্তার নহে। বোধ হইতেছিল ৺কালী কাহাকেও শাসাইতেছেন। ঐ দিন রাত্রিতে পিতার প্রশ্নের উত্তরে শোভা বলেন, "ঠাকুরের আসনের সম্মুখে বসিয়া দু'একবার নাম নেওয়া-মাত্রই চোখের সামনে ৺রাধাকৃষ্ণ-প্রভৃতি অনেক দেবদেবী আসিয়া উপস্থিত হন। দাদা গুরুজীও থাকেন। ব্রহ্মা, বিষ্ণু; শিব, দুর্গা কালীও থাকেন। একটি 'ওঁ' থাকেন, সেটি যেন জীবন্ত এবং খুব উজ্জ্বল। ইহার পর যেন সব দেবতার সঙ্গে এক হইয়া যাই। তখন কিছু দেখা যায় না কেবল একটা আনন্দের বোধ থাকে। সে আনন্দটা যে কে ভোগ করিতেছে তাহাও বলিতে পারি না।"

সুকুমারবাবু। অন্য সময়ে কিরূপ বোধ হয়?

শোভা। কিছুর দিকে মনোযোগ দিলেই মনে হয় যেন সবই শ্রীকৃষ্ণ কিংবা সেই সজীব "ওঁ"টি। কখনও কখনও দেখি

শ্রীকৃষ্ণ বাঁশী হাতে একটি পদ্মের উপর দাঁড়াইয়া। তখন খুব ভাল লাগে—অনেকক্ষণ ধরিয়া দেখিতে পারি। এক হইয়া গেলে এইরূপ আনন্দ হয় না। তখন কোথায় থাকি বলিতে পারি না। একদিন শূন্যে দাঁড়াইয়া শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন, "জগৎ আছে সত্য, তবে আমার এই রূপে আছে।" এই বলিয়া তিনি নিজের বুকে আঙ্গুল দিয়া দেখাইয়া দিলেন। এই "রূপ"টা যে কি তাহা আমি বুঝি, কিন্তু তোমাদিগকে বুঝাইতে পারি না। আরও অনেক কথা অনেক সময়ে হয়; সে সব সাংসারিক কথা নয়। কথাগুলি আমার ভিতরে আছে, কিন্তু মুখ দিয়া বাহির হইতেছে না; যেন আসে না।

একদিন কয়েকটি লোককে প্রসাদবিতরণ করিতে করিতে শোভাতে হনুমানকে অন্নদানে রতা সীতার আবেশ ব্যক্ত হয়। অন্য একদিন (২৬শে ভাদ্র) সুকুমারবাবুর গৃহে শয্যায় শুইয়া কার্পেটের এক বৃহৎ কালীমূর্ত্তির দিকে তাকাইয়া শোভা বলেন, "মা কালীর চোখ দিয়া যেন আগুন বাহির হইতেছে। মা কালীকে অন্যভাবে যখন দেখি তখন আমার ভাল লাগে, কিন্তু যখন চোখ দিয়া আগুন ছুটিতে থাকে, তখন একটু ভয়-ভয় করে। এই দেখ মা বললেন, 'এই ছবির ভিতর আমি জীবন্ত অবস্থায় আছি।' এই কথা বলিতে বলিতে শোভা সমাধিস্থা হইলেন। বাহ্যজ্ঞান ফিরিয়া আসিলে তাঁহাকে প্রশ্ন করায় তিনি বলিলেন, "মা বল্লেন, তোর বাবার সেবায় আমি তুষ্ট হইয়াছি। তাই কন্যারূপে এই ভাবে আসিয়াছি। আমি আর তুই এক।' "

ইতঃপূর্বে উজানচরে শোভা একদিন বলেন, "মা কালী বলিয়াছেন, তোর বাবা আমার পায়ে আর রক্তচন্দন দেয় না কেন ?"

পূর্বেই বলা হইয়াছে সুকুমারবাবু বাল্যাবধি একখানি চিত্রগতা ৺কালীর পা ধুয়াইয়া চরণামৃত পান করিতেন এবং দীক্ষার পূর্ব পর্য্যন্ত তাহাতে রক্তচন্দন লাগাইতেন। এখন হইতে পুনরায় তিনি সেই ছবির পায়ে রক্তচন্দন দিতে থাকেন।

২রা আশ্বিন তারিখে দেখা গেল শোভা ঠাকুরকে সচন্দন তুলসীপত্র দিতে গিয়া ভাবস্থ হইয়া নিজের পায়েই তাহা দিলেন।

এই সময় পর্য্যন্ত কেবল শোভা ভোগ নিবেদন করিলেই তাহাতে ঠাকুরের ও বাবজী মহারাজের কোনও না কোনওরূপ গ্রহণচিহ্ন থাকিত। ৩রা আশ্বিন সুকুমারবাবু ভোগনিবেদন করেন। ঐ দিন খৈ, দধি ও দুইখানি বাতাসা দিয়া ভোগ দেওয়া হয়। ভোগনিবেদনান্তে দেখা গেল খৈয়ের মধ্যস্থলে কতকটা স্থান ফাঁকা। যেন কেহ ঐ স্থান হইতে খৈ নিয়াছে বা সরাইয়া দিয়াছে। দধির সরটুকু নাই।

ইতঃপূর্বে একদিন (৫ই বৈশাখ তারিখে) শোভা প্রকাশ করেন যে, বাবাজী মহারাজ বলিলেন ভোগ নিবেদন কালে কাহারও সেই ঘরের ভিতরে থাকা উচিত নয়। তাহাতে শোভা উত্তর করেন, "আমি যে থাকি ?"

বাবাজী। তোমার ত তখন জ্ঞান (বাহ্য) থাকে না।

অন্নভোগ দিলে অন্নগ্রহণ করিতে যত সময় লাগিতে পারে তত সময় এবং জলখাবার দিলে তাহা খাইতে যতটুকু সময় লাগিতে পারে ততটুকু সময় কাহারও সেই ঘরে থাকা উচিত নয়।

উক্ত আদেশ অনুসারে এক শোভা ভিন্ন কেহ ভোগ নিবেদন করিতে গেলে তিনি নিবেদন করিয়াই বাহিরে আসিয়া অপেক্ষা করিতেন, এবং আজকালও করেন। ১৪ই আশ্বিন তারিখেও সুকুমারবাবু ভোগ দিবেদন করার পর তাহাতে গ্রহণের চিহ্ন ছিল। সবিস্তর বিবরণ অনাবশ্যক। ইহার পর শোভার মাতাঠাকুরাণী ভোগ দিলেও মধ্যে মধ্যে তাহাতে গ্রহণের নিদর্শন দেখা গিয়াছে। মনে হয় ইঁহাদের মনে ভোগ গ্রহণ-সম্পর্কে প্রথমে যে সংশয় (নানা বিপরীত প্রমাণসত্ত্বেও) ছিল এবং যাহা পুনঃ পুনঃ পরীক্ষা বা অনুসন্ধানের ফলে এখন খুবই মন্দীভূত হইয়াছিল, তাহা একেবারে নিঃশেষে দূর করিবার জন্যই তাঁহাদের পূজনীয় গুরুদেব তাঁহাদের নিবেদিত ভোগেই গ্রহণের স্পষ্ট নিদর্শন রাখিয়াছিলেন। অবশ্য অন্য কারণ থাকাও সম্ভব। তাহার আলোচনা অনাবশ্যক। আমার বাড়ীতেও একদিন (অবশ্য একদিনমাত্রই) শোভা মায়ের আদেশে বাড়ী হইতে সকলের অনুপস্থিতি-কালে আমার স্ত্রীকর্ত্তৃক নিবেদিত "বৈকালী"তেও ৺ঠাকুরজী বা বাবাজী মহারাজের পরম অনুগ্রহের সুস্পষ্ট নিদর্শন দেখা গিয়াছিল। বিবরণ অনাবশ্যক।

সাভ

এই পরিচ্ছেদ শিশিরবাবুর ডায়েরী হইতে সুকুমারবাবুর ডায়েরীতে উদ্ধৃত অংশ অবলম্বনে লিখিত হইতেছে। শোভা কোণ্ডা যাওয়ার পথে ব্রাহ্মণবাড়িয়াতে আসিয়াছেন। ১৪ই আশ্বিন সেখানে তিমি অন্নভোগ নিবেদন করিলে তাহাতে নীল রঙের ছাপ দেখা গিয়াছিল। পরদিন শিশরবাবুর প্রশ্নের উত্তরে শোভা বলেন, "শ্রীকৃষ্ণের হাতের নীলপদ্মের দাগ কাল অন্নের উপর পড়িয়াছিল।"

তারিখ ১৬ই আশ্বিন। স্থান কোণ্ডা। শোভা বাবাজী মহারাজের পটের দিকে তাকাইয়া সমাধিস্থা। বাহ্যজ্ঞান ফিরিয়া আসিলে শিশিরবাবু বলিলেন, "ঠাকুরকে ও বাবাকে ফুল দিলে না? শোভা তৎক্ষণাৎ আবার আসনে বসিলেন এবং একটি পদ্মফুল হাতে নিয়া সমাধিস্থা হইলেন। কিছুক্ষণ পরে আস্তে আস্তে ফুলটি নিজের পায়েই দিলেন। পরে আর একটি ফুল নিয়াও তাহাই করিলেন। ফুল দিয়া উঠিয়া আসিলে শিশির-বাবু জিজ্ঞাসা করিলেন, "ফুল কাহাকে দিলে?"

শোভা। একটি বাবাজীকে ও একটি ঠাকুরজীকে।

৺সন্তদাস বাবাজীকৃত শ্রীশ্রীরামদাস কাঠিয়া বাবার জীবনীতে সাধকদের পর পর সাতটি ভূমিলাভের উল্লেখ আছে। তন্মধ্যে প্রথম পাঁচটি ভূমির অবস্থার কিছু কিছু বিবরণ দেওয়া

হইয়াছে। ষষ্ঠ ও সপ্তম ভূমির অবস্থা বিবৃত হয় নাই। শিশির-বাবু বৃন্দাবনে একদিন বাবাজী মহারাজকে জিজ্ঞাসা করেন, "এই স্থূলদেহে সাধক যে পর্যন্ত পৌঁছিতে পারে আপনি সেস্থানে পৌঁছিয়াছেন কিনা তাহা আপনার মুখ হইতে শুনিতে ইচ্ছা হয়।" তাহাতে তিনি উত্তর করেন, "বাবা, বল্লেই কি বিশ্বাস হবে? তবে তোমরা যে সদ্‌গুরু পাইয়াছ এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই।" এই কথাগুলি ১৭ই আশ্বিন তারিখে শিশিরবাবুর মনে হয়। ঐ দিন সন্ধ্যায় আরতির পরে শোভার দেহে বাবাজী মহারাজের দাঁড়াইবার ভঙ্গী দেখা গেল। তৎপর আহ্নিক সমাপন করিয়া আসিয়া শোভা শিশিরবাবুকে বলিলেন, "ঠাকুরজী বাবাকে দেখিয়ে বল্লেন ও সপ্তমভূমিতে উঠে দেহ রেখেছে।"

শোভা এতদিনে কোন ভূমিতে উঠিয়াছেন উহা জানিবার কৌতূহল হওয়ায় ১৯শে আশ্বিন আরিখে শিশিরবাবু বলেন, "শোভা, আমি যার অবস্থা জনতে চাই তার নাম তোমাকে বলব না. সে এখন কোন্ ভূমিতে আছে এবং অমুকের (কোনও একটি বিখ্যাত সাধকের) তুলনায় তার অবস্থা কিরূপ?" ইহার একটু পরে একটি লোকের মুখে গান শুনিতে শুনিতে শোভা সমাধিস্থা হন এবং অনেকক্ষণ ঐ অবস্থায় থাকেন। তারপর তিনি শিশির-বাবুকে ডাকিয়া আনিয়া বলেন, "বাবা বলেছেন সে চতুর্থ ভূমি লাভ করেছে এবং অমুক অপেক্ষা অবস্থা অনেক উচ্চ।"
এই কথা শুনিয়া শিশরবাবু অত্যন্ত বিস্মিত হন, কেননা ৺সন্তদাস বাবাজী-প্রদত্ত ভূমিসকলের বিবরণে বলা হইয়াছে যে. চতুর্থভূমি-

প্রাপ্ত পুরুষ অতি বিরল। কাহার সম্বন্ধে উপরি-উক্ত প্রশ্ন করা হইয়াছিল তাহ জানিবার জন্য শোভা অত্যন্ত জিদ্ করেন, কিন্তু শিশিরবাবু তাহা তাঁহাকে বলেন নাই। ইহার পরে পূর্ব্বোক্ত গায়কটি আর একটি গান গাহিতে থাকে এবং সঙ্গে সঙ্গেই শোভার সমাধি হয়। এই সময়ে শোভা কবে চতুর্থভূমি অতিক্রম করিয়া পঞ্চভূমিতে উঠিবেন তৎসম্বন্ধে শিশিরবাবুর মনে একটা প্রশ্নের উদয় হয়। কিয়ৎকাল পরে শোভার সমাধির অবস্থা তিরোহিত হইলে তিনি শিশিরবাবুকে বলেন, পৌষ মাসের একেবারে প্রথমে সে পঞ্চমভূমিতে পা দিবে।"

ঐ দিনই নৈশ ভোজনের পরে শিশিরবাবুর সহিত শোভার নিম্নোক্তরূপ কথা হয়ঃ—

শিশির। তুই সর্বত্রই কি ঠাকুরকে দেখ্‌তে পাস্?

শোভা। হাঁ, এমন কি বালুকণার মধ্যেও ঠাকুরকে দেখতে পাই।

শিশির। তোর নিজের সম্বন্ধে কিরূপ দেখ্‌তে পাস্?

শোভা। সকলের মধ্যেই আমি রয়েছি দেখ্‌তে পাই।

শিশির। তোর নিজেকে কি খুব বড়—সর্বব্যাপী ব'লে মনে হয়?

শোভা। হাঁ ভাইদা, কোনও কোনও সময় মনে হয় আমি যেন সমস্ত সংসারটা ব্যাপিয়াই আছি। রবিবারে কথা বন্ধ থাকে সেইদিনেই এই অবস্থা বেশী হয়। আচ্ছা, ভাইদা, এরূপ কেন হয়?

শিশির। এইরূপই হয়।

চতুর্থভূমিতে সাধকের যেরূপ অবস্থা হওয়া সম্ভব বলিয়া শিশিরবাবুর ধরণা ছিল, শোভাতে সেইরূপ সেইরূপ অবস্থা সত্যই বিকশিত হইয়াছে কি না পূর্বোক্তরূপ বহুবিধ প্রশ্নদ্বারা শিশিরবাবু তাহাই এই সময়ে পরীক্ষা করিতেছিলেন। ফলে দেখা গিয়াছিল, শিশিরবাবুর কয়েকটি ধারণা সত্য, আবার দু'একটি ধারণা সত্যও নহে। শেষোক্তগুলি-সম্বন্ধে কৌশলে প্রশ্ন করিয়া উত্তর পাওয়া গিয়াছে যে, পঞ্চমভূমির পূর্বে ঐ ঐ অবস্থা ঠিক খোলে না। সকলগুলির বিবরণ এই গ্রন্থে দেওয়া নিষ্প্রয়োজন।

২০শে আশ্বিন তারিখে শিশিরবাবু জিজ্ঞাসা করেন, যে সাধকটি চতুর্থভূমিতে আছে বলিয়া কল্য বলিয়াছ, তাহার যে সমাধি হয় তাহা সম্প্রজ্ঞাত কি অসম্প্রজ্ঞাত সমাধি? অল্প সময়ের মধ্যেই ধ্যানস্থা হইয়া ধ্যানভঙ্গের পর শোভা বলিলেন, "বাবা বলেছেন, সে এখন নির্বিকল্প সমাধির অবস্থায় আছে। আচ্ছা, ভাইদা, নির্বিকল্প সমাধি বলিয়া কিছু আছে কি?"

ইহার পর এই দিন হইতে কয়েক দিন পর্য্যন্ত শিশিবাবু বহু সাধক এবং অন্যরূপে বিশিষ্টশক্তিশালী পুরুষদিগের মধ্যে কে কোন্ ভূমিতে আছেন এই বিষয়ে শোভাকে বহু প্রশ্ন করেন। সকল প্রশ্নের উত্তর আপাততঃ প্রকাশ্য নহে। নিম্নলিখিত উত্তরগুলি অনেকের চিত্তাকর্ষক হইবে মনে করিয়া এ স্থলে উদ্ধৃত হইল। বলা বাহুল্য সকল প্রশ্নেরই উত্তর শোভা প্রশ্নের পর কিয়ৎকালের জন্য ধ্যানস্থা হইয়া ধ্যানভঙ্গের পরে দিয়াছিলেন।

উত্তরগুলি এখানে যেভাবে সাজাইয়া দেওয়া হইল, সেগুলি সেই ক্রমেই পাওয়া গিয়াছে এইরূপ মনে করিতে হইবে না। অনেক স্থলেই কোনও ব্যক্তি বা বিষয় সম্বন্ধে সকল প্রশ্ন একদিনে করা হয় নাই। এ স্থলে একজন-সম্বন্ধে নানা প্রশ্নের উত্তর এক-স্থানেই দেওয়া গেল না।

৺সন্তদাস বাবাজী তৃতীয়ভূমির শেষভাগে তাঁহার বইগুলি লেখেন। চতুর্থভূমিতে উঠিয়া তিনি বৃন্দাবন যান এবং পঞ্চম-ভূমিতে উঠিয়া তিনি দীক্ষা দিতে আরম্ভ করেন। শিবপুর আশ্রমে বিগ্রহ প্রতিষ্ঠার সময় তিনি সপ্তমভূমিতে উঠেন। সন্তদাস বাবাজী সম্বন্ধে সকল প্রশ্নের উত্তর ঠাকুরজী দেন। বাবাজীর কৃত সাংখ্যতত্ত্ব-ব্যাখ্যা ঠিক কিনা এই প্রশ্নের উত্তরে বলা হয়—তাঁহার সমস্ত কথাই ঠিক; ভেদাভেদ সিদ্ধান্তের ব্যাখ্যা ঠিক; ঐ সিদ্ধান্ত জগৎ শীঘ্র গ্রহণ করিবে কি না এই প্রশ্নের কোনও উত্তর পাওয়া যায় নাই।

৺সন্তদাস বাবাজী ট্রেণে কেন দেহ রক্ষা করিলেন এই প্রশ্নের উত্তরে সন্তদাস নিজে বলেন, “পাগলী মা, ও সব জেনে কি হবে? সব আমার গুরুজীর ইচ্ছা।” তারপর কাঠিয়া বাবাজী বলেন, “ওর দেহরক্ষার পূর্ব্বে আমি দেখিলাম এখানে (নিজেদের স্থান দেখাইলেন) ওর অনেক কাজ আছে। কাজেই ওকে এখানে নিয়া আসিলাম ও যদি বৃন্দাবনে পৌঁছিত তাহা হইলে সহজে ওকে আনিতে পারিতাম না।” বাবাজী (সন্তদাস) এ কথা জানিতেন কিনা এবং জানিলে কলিকাতায়

কেহ দেহ রক্ষা করিলেন না, শিশিরবাবুর এই প্রশ্নের এইরূপ উত্তর পাওয়া যায়ঃ "ও সব জেনেও জানত না; ও সবই গুরুজীর খেলা মনে করত।......"

শোভাসম্বন্ধে একটি প্রশ্নের উত্তর এইরূপ পাওয়া যায়, "তোমরা যে সাধকের কথা মনে করিয়া প্রশ্ন করিতেছ আমি ইচ্ছা করিয়াই তাহাকে তাহার অবস্থা বুঝিতে দিব না। সাধারণতঃ সাধকেরা চতুর্থ ভূমিতে উঠিলেই নিজের অবস্থা বুঝিতে পারে। ও (শোভা) যে গুরুকৃপাতেই উঠ্‌ছে।"

অন্য দিন অন্য প্রশ্নের উত্তরে পাওয়া যায়—শোভা পঞ্চম ভূমির মাঝামাঝি পূর্ণব্রহ্মজ্ঞা হইবেন।

শোভা কতদিনে পূর্ণব্রহ্মজ্ঞা হইবেন ইহার উত্তরে বলা হয় ঐ বৎসর ১লা পৌষ হইতে ২ মাস ১৩ দিনের মধ্যে।

চতুর্থ ভূমিতে পা দিতে দিতেই নির্ব্বিকল্প সমাধি হয়। পঞ্চম ভূমিতে সর্ব্বত্র যাতায়াত করিতে পারা যায়। হঠ-যোগীদের পঞ্চম ভূমিলাভের পূর্ব্বে দূরদর্শন, দূরশ্রবণ. শূন্যে গমনাদি বিভূতি লাভ হইতে পারে। অমুকের (দুই জন হঠ-যোগীর) তাহাই হইয়াছিল।

দ্বিতীয় ভূমির শেষ অবস্থায় ও তৃতীয় ভূমির প্রথম অবস্থায় নির্ব্বিকল্প সমাধির মত এক রূপ সমাধি হইয়া থাকে; কিন্তু নির্ব্বিকল্প সমাধিতে যে আনন্দের অনুভূতি হয় (যদিও অনুভব কর্ত্তা কে তাহা বুঝা যায় না। অনেক সাধক ইহাকে

৫

নির্বিকল্প সমাধি মনে করিয়া নিশ্চিন্ত হইয়াছে।) ঈশ্বরকোটি না হইলে (নির্বিকল্প) সমাধির পর কেহ দেহে ফিরে না একথা সত্য নহে।

তৃতীয় ভূমিতেই সাধক কখনও কখনও মনে করেন যে, তিনি অবতার বা সাক্ষাৎ কোনও দেবতা ইত্যাদি। ইহা অবশ্য উচ্চ অবস্থার কথা নহে। বামদেব ঋষি পঞ্চম ভুমির মাঝামাঝি অবস্থায় বলিয়াছিলেন "অহং মনুরভবং সূর্য্যশ্চ।" শ্রুতিতে যে আছে, "সে যদি পিতৃলোককামো ভবতি, সঙ্কল্পাদেব অস্য পিতরঃ সমুপতিষ্ঠন্তি" এই অবস্থা সপ্তম ভূমির মাঝামাঝি হইতে পারে।

পঞ্চম ভূমিতে আরোহণমাত্রই পুরুষকে পূর্ণব্রহ্মজ্ঞ বলা যায় না। পঞ্চম ভূমির মাঝামাঝি পূর্ণব্রহ্মজ্ঞতা আসিতে পারে।

৺কালীর উপাসকেরা সপ্তম ভূমিতে পূর্ণব্রহ্মজ্ঞ হন। রাম প্রসাদ ও সর্ব্বানন্দ এই দেহেতেই পূর্ণব্রহ্মজ্ঞ হইয়াছিলেন। গায়ত্রী উপাসকেরা সপ্তম ভূমিতে উঠিতে পারেন না। এবং পূর্ণব্রহ্মজ্ঞ হইতে পারেন না তাঁহাদের উচ্চতম গতি দেবী-লোক।

কর্ম্মের ফলাকাঙ্ক্ষা ও কর্ত্তৃত্ববুদ্ধি তৃতীয় ভুমিপ্রাপ্ত সাধকেরই থাকে না।

প্রশ্ন। কোনও সাধকের (শিশিরবাবুর অভিপ্রায়—শোভার) মধ্যে যে কালী, কৃষ্ণ, গোপাল প্রভৃতি মূর্ত্তির অভিব্যক্তি হয় তাহার কারণ কি?

উত্তর। নির্বিকল্প সমাধির অবস্থায় যখন কোনও সাধকের

উপর কোনও দেবতার পূর্ণভাবে আবেশ হয়, তখন সাধক সেই ভাব সামলাইতে না পারিলে তদ্রূপ হইয়া যায়। *

নির্বিকল্প সমাধির পরেও অনুভূতি আছে। তখন জগৎ সত্য ও জীব নিত্য এই অনুভূতি হয়।

———

* সুকুমারবাবুর ডায়েরীতে দেখা যায় ইহার পরে ২রা পৌষ তারিখে কুমিল্লার প্রিয়বাবু (পূর্ব্ব উল্লিখিত শ্রীযুক্ত প্রিয়নাথ চক্রবর্ত্তী) কোনও একখানি পুস্তক হইতে কিয়দংশ পাঠ করিয়া শোভাকে শুনান। ভক্তের দেহে দেবতার আবেশের বিষয় ঐ স্থানে আলোচিত হইয়াছে। শোভা সে সকল কথা সমর্থন করিয়া তদতিরিক্ত কিছু বলেন। তাহা এইরূপ—ভক্তের শরীরে দেবতার আবেশ হইলে যদি সেই ভক্তের তাঁহাদের শক্তি ধারণ করিবার ক্ষমতা না থাকে, তবেই বাহিরে তাঁহাদের রূপ প্রকাশ হইয়া থাকে। তবে সাধকের শক্তিধারণ করার ক্ষমতা থাকিলেও ভক্তদের মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করিতে বা তাহাদিগকে কৃতার্থ করিতে দেবতা রূপের বাহ্য বিকাশ দেখাইতে পারেন।

আট

স্থান কোণ্ডা। কার্ত্তিক মাসের (১৩৪৩) শেষভাগ। সুকুমারবাবু শোভা প্রভৃতি সহ স্বগ্রামে আসিয়াছেন। উষা মাও সঙ্গে আছেন। ২১শে কার্ত্তিক তারিখে উষা মার ইচ্ছা হইল শোভার আধারে তিনি স্বীয় গুরুদেব সন্তদাস বাবাজীর পূজা করিবেন। শোভার প্রাতঃকালীন আহ্নিক শেষ হইলে উষা মা সকল পূজোপকরণ নিয়া আসিলেন। উহা দেখিয়া শোভা বলিলেন তিনি ঠাকুরের পূজা করিবেন।

পূজা করিতে বসিয়া শোভা অন্যান্য দিনের মত আসনের উপর মাথা রাখিয়া সমাধিস্থা হইয়া গেলেন। কিয়ৎক্ষণ পরে তিনি সেই আসনের উপর বংশীধর-ভঙ্গিতে বসিলেন। উষা পূজা আরম্ভ করিলেন। তখন বাড়ীর সকলে সেখানে সমবেত হইয়াছেন। তাঁহারা বংশীধর মুর্ত্তি শোভার চরণে পুষ্পাঞ্জলি দিলেন। তাহার পর শোভ ৺কালীর ভঙ্গিতে দাঁড়াইলেন এবং যষ্ঠিহস্ত সন্তদাস বাবাজী মহারাজের ভঙ্গী ধারণ করিলেন। তখন সকলেই প্রণত হইয়া পুষ্পাঞ্জলিদান ও আরতি করিতে লাগিলেন এবং পরে ভোগের দ্রব্য সম্মুখে রাখিয়া বাহিরে আসিলেন। যথাসময়ে দ্বার খোলা হইলে দেখা গেল শোভা গোপালের আবেশে এক মুষ্টি হালুয়া নিয়া মুষ্টিটি মুখের মধ্যে অর্দ্ধপ্রবিষ্ট করিয়া রহিয়াছেন। ক্ষণেক পরে তিনি হামাগুড়ি

দিয়া স্বস্থানে আসিলেন ; তৎপর তঁাহোর আবেশভঙ্গ হইল।

এই সময় হইতে কয়েক দিন পূর্ব্বোক্তরূপ ভাবাবেশে ও শোভার আধারে আত্মীয়গণের গুরু ও নানা দেবদেবীর পূজা, অঞ্জলিদান ইত্যাদি চলিয়াছিল। কোনও দিন গুরুর আবেশে শোভাকে মাতা, পিতা ও অন্য লোকেরও মাথার দিকে ধীরে ধীরে হস্ত প্রসারিত করিয়া আশীর্ব্বাদের ভঙ্গী করিতে দেখা গিয়াছে।

কোণ্ডা হইতে শোভা কুমিল্লা আসেন। ২৬শে কার্ত্তিক তারিখে প্রিয়নাথবাবুর বাসায় ৺কালীভাবে আবিষ্টা শোভার পূজার পর ভোগ দেওয়ার সময় সুকুমারবাবু তাহা নিবেদন করিতে বসিলে, শোভা আবিষ্ট অবস্থায় মৃদুহাস্যযুক্ত মুখে বলিলেন "জল দিস্ নাই ত !" দেখা গেল সত্যই জল দেওয়া হয় নাই। এইরূপ সমাধির অবস্থায় ইতঃপূর্বে শোভার মুখে কোনও কথা উচ্চারিত হইতে শুনা যায় নাই। সুকুমারবাবু লিখিতেছেন— "কি স্নেহময় সেই স্বর !"

২৯শে কার্ত্তিক অন্নকূট উৎসব করিবার উদ্দেশ্যে পূর্ব্বরাত্রি ১২টার পর রন্ধন করিলে পরদিন ভোগ বাসি হওয়ার দোষ হয় না। পঞ্চান্ন বা ষাট-প্রকার ব্যঞ্জন রাঁধা হইল ; শোভাই অধিকাংশ রান্না করিলেন। ইতঃপূর্বে রান্না বা পরিবেষণের অভ্যাস তাঁহার বড় একটা ছিল না। পরদিন যথাসময়ে ভোগ-নিবেদন হইল। বলা বাহুল্য ভোগে নানা গ্রহণচিহ্নই ছিল। অন্নকূট উৎসব দেখিতে বহু লোক আসিয়াছিল—নিমন্ত্রিত ভিন্ন

বহু লোক প্রসাদ পাইতে বসিয়া গেল। শোভা বলিলেন, "পরিবেশন আমি করিব। সকলে পেট ভরিয়া খাও, কিছুই কম পড়িবে না"। তাহাই হইয়াছিল। পরে এক দিন (১লা অগ্রহায়ণ তারিখে বরকান্তায়) শোভা প্রকাশ করেন, "অন্নকূটের রাঁধা রাঁধিয়া প্রাতে বাবার কাছে গিয়া বলিলাম, তুমি ত লেপ মুড়ি দিয়া আছ; দেখ দেখি আমি কত কি রান্না করিয়া আসিলাম। ইহাতে বাবা বলিলেন, 'কই, তুই রাঁধলি কোথায়? আমিই ত রাঁধিলাম।"

কুমিল্লায় শোভাকে নানা ব্যক্তি নানাপ্রশ্ন করেন। এই সময়ে দেখা যায় যে, তিনি পূর্ববৎ ধ্যানান্তে জবাব দিতেছেন না, স্বাভাবিক ক্রমেই জবাব দিতেছেন। তিনি নির্বিকল্প সমাধির ভিন্ন ভিন্ন স্তর ঐ সকল ব্যক্তির কাছে ব্যক্ত করেন। নিজের অবস্থা সম্বন্ধে বলেন, "এখন আহ্নিক সারিয়া উঠার পর সাত আট ঘণ্টা পর্য্যন্ত আনন্দবোধ চলিতে থাকে। এক একবার মনে হয় আনন্দটা আমিই বোধ করি; আবার দেখি আমি নাই, অথচ আনন্দবোধটা আছে।"

প্রশ্ন। ইহা কি নির্বিকল্প সমাধির মধ্যম অবস্থা?

উত্তর। হাঁ।

১লা অগ্রহায়ণ তারিখে বরকান্তায় ডাঃ সতীশ নন্দী শোভাকে নানা প্রশ্ন করেন। এ দিনও শোভা স্বাভাবিক ক্রমেই অর্থাৎ প্রশ্নের পরে ধ্যানস্থা হইয়া ধ্যানান্তে উত্তর না দিয়া প্রশ্নের অব্যবহিত পরেই উত্তর দেন।

ডা৹ নন্দী। কুণ্ডলিনী-শক্তি জাগরিত হইলে তাহা বুঝিবার উপায় কি?

শোভা। কুণ্ডলিনী-শক্তি জাগরিত হইলে সাধন করিতে বসিলে মাঝে মাঝে শরীর শিহরিয়া উঠে এবং কম্প হয়।

ডাঃ নন্দী। গৃহীদের কৌপীন পরার আবশ্যকতা আছে কি?

শোভা। আছে, তবে কেবল কৌপীন পরিলে হয় না, তাহার সার্থকতাও দেখিতে হয়।

ডাঃ নন্দী। সার্থকতা কিরূপ?

শোভা কোনও উত্তর দিলেন না। ডাঃ নন্দী উহা জানিবার জন্য আগ্রহ প্রকাশ করিলে শোভা ধ্যানস্থা হইয়া উত্তর করিলেন, "বীর্য্য ধারণ করিলেই কৌপীন পরার সার্থকতা হয়।"

২রা অগ্রহায়ণ হইতে আবার দেখা গেল প্রশ্ন করিলে শোভা পূর্ব্ববৎ ধ্যানস্থা হইয়া উত্তর জানিয়া লইয়া উত্তর দিতেছেন, আবার মাঝে মাঝে সাধারণ ক্রমেও উত্তর দিতে-ছেন। ধ্যানস্থা হইয়া শোভা কিভাবে উত্তর জানিতে পারেন সে সম্বন্ধে প্রশ্ন করা হইলে তিনি বলেন, "দেবদেবী, গুরুজী, ঠাকুরজী, দাদাগুরুজী প্রভৃতিকে দেখিতে ও তাঁহাদের কথা শুনিতে পাই। তাঁহাদের মুখও নড়িতে দেখি।"

৯ই অগ্রহায়ণ রাত্রিতে আহ্নিক করিবার সময় দেখা গেল শোভা আসন হইতে মাথা তুলিয়া এক অসাধারণ ভাবে শূন্যে

তাকাইয়া আছেন! চক্ষুতে যেন একটা ভয়ের ভাব। কিছুক্ষণ পরে শোভা মাথা নাড়েন; পরে অন্যদিনের মত আসনে মাথা রাখিয়া কিছুক্ষণ পড়িয়া থাকেন। বাহ্যজ্ঞান হইবার পর বাহিরে আসিলে তাঁহাকে সুকুমারবাবু প্রশ্ন করেন, "আজ কেহ আসিয়াছিলেন কি?"

শোভা। বাবা, আজ আমি বিশ্বরূপ দেখেছি।

সুকুমার বাবু। কি রকম?

শোভা। শ্রীকৃষ্ণ বল্লেন, "পাগলী মা, বিশ্বরূপ দেখবি?"

আমি বল্লাম,—হাঁ দেখব, যদি দেখাও। শ্রীকৃষ্ণ বল্লেন—"ভয় পাবি না ত?" আমি বল্লাম, তুমি যদি ভয় পেতে দাও তবেই পাব, আর যদি ভয় পেতে না দাও তবে পাব না। তখন শ্রীকৃষ্ণ বল্লেন, "আচ্ছা তবে দেখ্।" এই কথার সঙ্গে সঙ্গে দেখি শ্রীকৃষ্ণ আর নাই। সেখানে একটা বিরাট দেহ। তার মধ্যে ব্রহ্মলোক, সত্যলোক, সংসার, নরক সব আছে—আরও কতলোক যে আছে তার ইয়ত্তা নাই। কোথাও অপ্সরারা নাচিতেছে। কোথাও কাহারও ছেলে হইয়াছে, বাপ মা হাসিতেছে; কোথাও কাহারও ছেলে মরিয়াছে তার পাশে তার বাপ মা কাঁদিতেছে। সত্যলোকে কত মহাপুরুষ বসিয়া আছেন, তাঁহারা পদ্মাসনে ধ্যানস্থ হইয়া আছেন। অল্প সময়ের মধ্যে কত কিছু দেখিলাম। এক যায়গায় দেখিলাম একটা সোনার কলসীতে জল আছে; কলসীটা সোণার ঢাকনীতে ঢাকা। কত লোক সেই জল পান

করিতে চাহিতেছে, কিন্তু পারিতেছে না। এক জায়গায় একঠা পুকুরে কত পদ্ম ফুটিয়া আছে ; পরিষ্কার জল ; কে একজন সেই পুকুরে গেল আর হঠাৎ সেই সব জল পোকা-ময় হইয়া গেল। নরককুণ্ডে চিতা জ্বলিতেছে, আর পাপীরা "রক্ষা কর, রক্ষা কর" বলিয়া চীৎকার করিতেছে। কেহ কেহ বলিতেছে, "মহাপ্রভু রক্ষা কর" ; তাহারা অমনি চিতা হইতে উঠিয়া যাইতেছে। আরও কত কি যে দেখিলাম তাহা প্রকাশ করিতে পারিতেছি না। তখন আমি বলিলাম, আর দেখিতে চাই না। অমনি অখণ্ড আনন্দে মগ্ন হইয়া গেলাম।

শোভা বলিতে লাগিলেন, "তখন শ্রীকৃষ্ণ আমাকে বলিলেন—'পাগলী মা, ভয় পেয়েছিলি ?'

আমি বলিলাম, হাঁ।

শ্রীকৃষ্ণ। সবাই ত ভয় পায় !

আমি। সবার মধ্যে কি তুমি নও ?

শ্রীকৃষ্ণ। পিতাপুত্রে কি কিঞ্চিৎ প্রভেদ নাই ?

তার পর আর কিছু দেখিলাম না"

১২ই অগ্রহায়ণ তারিখে রাসপূর্ণিমা ছিল। ঐদিন স্থানীয় কাছারীর নায়েব শ্রীযুক্ত দুর্গাপ্রসন্ন বসুর বাসায় তাঁহার অনুরোধে শোভা তাঁহার গুরু শ্রীশ্রীগম্ভীরনাথ বাবাজীর জন্ম-তিথি-উৎসবে ভোগ নিবেদন করেন। ঠাকুরঘরটি ছোট, বেড়াও অনেক স্থানে ভাঙা। ভোগ যখন নিবেদন করা হইতেছিল

তখন বাহির হইতে স্থকুমারবাবু ও ডাঃ নন্দী ভিতরে এক-খানি উজ্জ্বল হস্ত সমস্ত ঘর আলোকিত করিয়া সঞ্চালিত হইতেছে দেখিতে পান। ইহা ছাড়া ডাঃ নন্দী দেখেন যেন ভিতরে স্থন্দর বস্ত্র-পরিহিতা একটি স্ত্রীমূর্ত্তি দাঁড়াইয়া আছেন। তুই-তিন মিনিট পরে ঘরের ভিতরের জ্যোতি অন্তর্হিত হয়। তারপর শোভা বাহিরে আসিলে প্রশ্নের উত্তরে তিনি প্রকাশ করেন যে, শ্রীশ্রীরাসেশ্বরী আসিয়াছিলেন। তারপর বাড়ীতে আসিয়া স্থকুমারবাবু ও ডাঃ সতীশ নন্দী ৺রাসেশ্বরীর পূজার বন্দোবস্ত করেন। শোভা যথারীতি ধ্যানস্থা হইয়া প্রথমে ঠাকুরজীর ও পরে বাবাজী মহারাজের দণ্ডায়মান অবস্থার ভঙ্গীতে স্থিত হন। কয়েক মিনিট পরে ঠাকুরের আসনের সিল্কের আচ্ছাদনে শ্বেত চন্দনের তুইটি পায়ের ছাপ দেখা যায়। ভোগনিবেদনের সময় গোপালভাব ব্যক্ত হয়। তার-পর পার্শ্ববর্ত্তী ঠাকুর ঘরে গিয়া দেখা গেল ঠাকুরজী ও বাবা-জীর চিত্রপটের মুখে ভোগাংশ লাগিয়া রহিয়াছে।

ঐ দিন শ্রীশ্রীরাসেশ্বরী কোনও ভাব বা ভঙ্গী ব্যক্ত হওয়ার কথা ডায়েরীতে উল্লিখিত হয় নাই। ডায়েরীতে এই দিনের ঘটনাবলী ডাঃ সতীশ নন্দীর হস্তে লিখিত।

২১শে অগ্রহায়ণ তারিখে দ্বিপ্রহরে স্থকুমারবাবু কোনও এক কারণে একবার স্কুল হইতে বাসায় আসিয়া দেখিলেন শোভার কপালে খুব নিপুণহস্তে তিলক কাটা রহিয়াছে। শোভাকে তৎসম্বন্ধে প্রশ্ন করাতে তিনি বলিলেন, "তুপুরে

ভোগ নিবেদন করিতে গেলে বাবাজী মহারাজ বল্লেন, 'এদিকে এস, তোমার তিলক করিয়া দিতেছি। আজ, কাল এবং পরশু আমি তিলক করিয়া দিব, ২৪শে বৃহস্পতি-বার হইতে তুমি নিজে তিলক করিবে।' এই বলিয়া তিনি বাম হাত দিয়া মুখখানি ধরিলেন, এবং তিলক করিয়া দিতে লাগিলেন, সঙ্গে সঙ্গে আমার বাহ্য চেতনা আর রহিল না।"

পরদিন শোভার তিলক কাটার সময় সুকুমারবাবু বাসায় থাকিয়া ব্যাপারটা লক্ষ্য করিবেন বলিয়া যথাসময়ে স্কুল হইতে আসিলেন। শোভা তাঁহার সমক্ষেই ভোগের দুধ নিয়া ঠাকুর ঘরে ঢুকিলেন এবং মিনিট পাঁচেক পরেই দুধের বাটী হাতে করিয়া বাহিরে আসিলেন। ইহার মধ্যেই তিলক কাটা হইয়া গিয়াছে। প্রশ্নের উত্তরে শোভা বলিলেন, আসনে বসামাত্র বাবাজী মহারাজ ও অনেক দেবদেবী আসিলেন। তারপর তিনি আর কিছু জানেন না। সুকুমারবাবু ঘরে ঢুকিয়া দেখিলেন প্রাতঃ সন্ধ্যার পর তাঁহার গোপীচন্দনাদি দূরে যেখানে সরাইয়া যেভাবে রাখিয়া আসিয়াছিলেন তাহা সবই ঠিক সেই খানেই সেই ভাবেই আছে। পরদিন সুকুমার বাবুর কথায় শোভা সেমিজের নীচে নাভিতে দেখিলেন সেখানেও তিলক চিহ্ন আছে। দ্বাদশ অঙ্গেই তিলক ছিল।

২৪শে অগ্রহায়ণ হইতে শোভা নিজেই তিলক করিতে থাকেন। তিলক করাকে নিম্বার্ক-সম্প্রদায়ে স্বরূপ করা বলা হয়।

ইহাদের মত শ্রীকৃষ্ণের অঙ্গেও ঐ সকল তিলকচিহ্ন আছে। বোধ করি সেই জন্যই তিলক করাকে "স্বরূপ" করা বলা হয়। সে যাহা হউক, ২৭শে অগ্রহায়ণ দ্বিপ্রহরে ভোগ দিবার সময় আসিল, তখনও শোভার স্বরূপ করা হয় নাই। শোভা বলিলেন, আমার স্বরূপ করিতে দেরী হইয়া যায়, বাবাই স্বরূপ করিয়া দিবেন। এমনিও সেমিজ গায়ে থাকার দরুণ যে যে স্থানে করিতে পারি না সে সব স্থানে তিনিই তাহা করিয়া দেন।" ভোগ দিয়া শোভা যখন বাহিরে আসিলেন তখন দেখা গেল স্বরূপ করা হইয়াছে।

বাবাজীর আদেশে ১লা পৌষ হইতে শোভাকে আর স্বরূপ করিতে হয় নাই। ২৬শে অগ্রহায়ণ সুকুমারবাবু শোভাকে জিজ্ঞাসা করেন, "তিলক করা হইতে তোমার অনুভূতির কোনও পরিবর্ত্তন টের পাও কি?" তদুত্তরে শোভা বলেন, "অন্য কোনও পরিবর্ত্তন টের পাই না, আনন্দ-অনুভূতির সময়টা অনেকটা বৃদ্ধি পাইয়াছে।" ১লা পৌষ আহ্নিকের সময় দেখা গেল শোভা তাঁহার সম্মুখস্থ আসনটিতে মাথা না রাখিয়া স্তিমিতনেত্রে বসিয়া জপ করিতেছেন। এই জপ এক ঘণ্টার উর্দ্ধকাল চলিয়াছিল, পরে তিনি প্রণাম করিয়া উঠিয়া আসেন। এই সময় সুকুমারবাবু জিজ্ঞাসা করেন, "অন্য দিন হইতে কোনও বিশেষ পরিবর্ত্তন আজ টের পাইলে কি?"

শোভা। হাঁ, অন্যদিন নাম নিতে বসিলে আপনা হইতে যে

জপ হইত, আজ সে জপ হয় নাই। আজ অন্য একটি মন্ত্র ভিতর হইতে উঠিতে লাগিল।

সুকুমারবাবু। বাবাজী মহারাজ বলিয়া দিলেন কি?

শোভা। টের পাই নাই।

সুকুমারবাবু। জপের সময় বাবাজী মহারাজ নিকটে ছিলেন কি?

শোভা। জপে যখন বসিয়াছিলাম, তখন বাবাজী মহারাজ, ঠাকুরজী ও অন্যান্য অনেক দেবদেবী উপস্থিত ছিলেন। তার পর আর কিছু বলিতে পারি না।

সুকুমারবাবু। জপ শেষ হইলে যখন তুমি প্রণাম করিলে তখন কি বাবাজী মহারাজকে দেখিলে?

শোভা। না দেখি নাই। কখন প্রণাম করিয়াছি তাহাই বলিতে পারি না।

সুকুমারবাবু। এই মন্ত্র জপ কি ভাবে হইতেছিল?

শোভা। দুই ভ্রূর মধ্যস্থলে আপনা হইতে জপ হইতেছিল। ইহা এখনও হইতেছে। সর্ব্বক্ষণই হইতেছে। আমার কোনও চেষ্টা করিতে হয় না।

৬ই পৌষ তারিখে সুকুমারবাবু তাঁহার ডায়েরীতে প্রসঙ্গক্রমে লিখিতেছেন,—"ইতিমধ্যে একদিন কথায় কথায় শোভা আমায় চুপি চুপি বলিল, 'বাবা বলেছেন, তুই এখন যাহা বলিবি তাহাই হইবে।"

ইহার পর কয়েক দিন ধরিয়া দেখা যাইতে লাগিল শোভা অতি ভোরে লেপ মুড়ি দিয়া জপ করিতে করিতে অনেকটা উঁচু হইয়া উঠেন। বসিয়া অত উঁচু হওয়া কোনও সাধারণ মানুষের পক্ষে সম্ভব নয়। ১১ই পৌষ তারিখে ঐ বিষয়ে তাঁহাকে প্রশ্ন করা হয়। উত্তরে তিনি বলেন, "শেষ রাত্রিতে বাবা আসিয়া ডাকেন, "পাগলী মা, ওঠ্।" আমি উঠিয়া জপে বসি; আমার গা খালি থাকে। মাঝে মাঝে শীত বোধ হয়, তখন বাবার কোলে উঠিয়া যাই।" ইহার অধিক তিনি আর কিছু জানেন না। ১৩ই পৌষ ও ১৪ই পৌষ লেপ উঁচু হইয়া উঠা ব্যাপার বাহিরের তুইটি লোকও দেখেন। ১৪ই লেপের নীচে তুইটি মস্তকের মত দেখা গিয়াছিল।

ইহার পর একদিন কথা হইয়াছিল, শ্রীগুরুজী মহারাজ বলিয়াছেন, তাঁহার সাধন যাহারা পাইবে তাহাদের তিন জন্মের মধ্যেই মুক্তি হইবে। এই কথার পুনরুল্লেখ করিয়া ২৩শে পৌষ তারিখে সুকুমারবাবু প্রশ্ন করেন, "তবে কি আমাদের জন্য শ্রীগুরুজীকে আবার দেহ ধারণ করিয়া আসিতে হইবে?"

শোভা। কথাটা এই: যাদের এই জন্মে সদ্‌গুরু হ'তে দীক্ষালাভ হবে, তারা পরজন্মেও সদ্‌গুরুর আশ্রয় পাবে। এমন হ'য়ে থাকতে পারে যে, যাঁরা গত জন্মে গোস্বামী প্রভুর বা গিরি মহারাজজীর কৃপা পেয়েছিলেন, তাদের কারও কারও এজন্মে আমাদের গুরুজী হ'তে দীক্ষা লাভ হয়েছে।"

এই বলিয়া কথায় কথায় শোভা তাহার কনিষ্ঠ ভাই গৌরকে (ইহার বয়স তখনই দুই বৎসর) দেখাইয়া বলিলেন, এর সদ্‌গুরুর কৃপার পরে এবার দ্বিতীয় জন্ম। এর কপালে তিলক চিহ্ন আছে। এই বলিয়া "ডাক্তারকে" (ডাক্তার নন্দীকে ?) ও স্নকুমারবাবুকে শোভা গৌরের কপালে জন্মান্তরীণ তিলকচিহ্ন দেখাইলেন। শোভা আরও বলিলেন, "গৌর গতজন্মে কে ছিল তাহা আমি জানি, মা ও তুমি কে ছিলে তাহাও জানি।"

———

নয়

প্রশ্ন। আমাদের এই সাধক যখন পূর্ণ ব্রহ্মাজ্ঞা হইয়াছে তখন সকল প্রশ্নের উত্তর দিতে পারে ?

উঃ। হাঁ।

প্রঃ। নিজের অবস্থা এ এখনও সমস্তটা বুঝে না কি ?

উঃ। না।

প্রঃ। ফাল্গুনের ঐ (অর্থাৎ ১৩ই) তারিখের পর হইতে সমস্তই বুঝিতে পারিবে ত ? অথবা তার পুর্ব্বেই ?

উঃ। ঐ তারিখের পর হইতে।

প্রঃ। এ সাধকের যখন পূর্ণব্রহ্মজ্ঞ অবস্থা তখন ত সবই জানিবার কথা। অথচ এই পঞ্চভূমিতেও এ নিজের অবস্থা সম্যক্ বুঝিতে পারিবে না জানিয়াছিলাম। এ দুয়ের সামঞ্জস্য কি ?

উঃ। এ সব বুঝেও বোঝে না। মনে করে এ সব গুরুর কৃপা।

২৭শে পৌষ তারিখে শিশিরবাবু শোভার পূর্ব্বজন্মের খবর জানিতে চাহিলে তিনি সমাধিস্থা হইয়া বলিলেন—পূর্ব্বজন্মের পিতার নাম প্রমোদচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, মাতা অক্ষয়া সুন্দরী দেবী। তাঁহার নিজ নাম ছিল কাত্যায়নী। ৮ বৎসর বয়সে কাত্যায়নীর দৈববলে দেবীকৃপা-লাভ হয়। সে সময়ে তাঁহার কোনও গুরু



তুলসীবনে মা

ছিলেন না। ত্রিপুরা জিলার কোণ্ডা গ্রামে তাঁহার পিতা বাস করিতেন। (পরে শুনিয়াছি ঐ গ্রাম তাঁহাদের পূর্ব্বপুরুষের নিবাস নহে, প্রমোদ চট্টোপাধ্যায়ই অন্যস্থান হইতে আসিয়া ঐ গ্রামে বাড়ী করিয়াছিলেন।) কাত্যায়নীর বয়স যখন ১০ বৎসর, তখন তাঁহার পিতা ও মাতা কোণ্ডা গ্রামের বাড়ী বিক্রয় করিয়া কাশী চলিয়া যান এবং সেইখানেই বাস করিতে থাকেন। সুকুমার বাবুদের বাটীতে যেখানে এখন চণ্ডীমণ্ডপ*, সেইস্থানে কাত্যায়নী প্রথম দেবীর কৃপা লাভ করেন। এবারে কোণ্ডায় জন্মের কারণ ঐ বাড়ী ছাড়িতে কাত্যায়নীর কষ্ট হইয়াছিল। তা' ছাড়া ঐ বাড়ীতে বহুদিন অব্যাহতভাবে দেবীপূজা হইয়া আসিতেছিল।

কাত্যায়নী কাশীতে থাকিয়া সাধনভজন করেন এবং পঞ্চাশ বৎসর বয়সে কৌমার্য্য অবস্থাতেই কাশীতে দেহরক্ষা করিয়া দেবীলোকে গমন করেন।

পরে শুনিয়াছি দেবীলোকে শোভা আড়াইশত বৎসর ছিলেন। দেবীলোকের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা কালী। এখন হয়ত বুঝা যাইবে শোভাতে ৺কালীর আবেশ কেন পুনঃ পুনঃ ব্যক্ত হইয়াছে এবং এখনও হয়।

প্রমোদ চট্টোপাধ্যায় ও তাঁহার পত্নী দেহান্তে সত্যলোকে গমন করেন।

---

* ১৩৪২ সালের ১৪ই ফাল্গুন এই গৃহে সন্তদাস বাবাজী মহারাজের তৈলচিত্র প্রতিষ্ঠিত হয়। তদবধি উহাতে চিত্রেরই সেবাপূজা হইয়া আসিতেছে।

সুকুমারবাবু ও তাঁহার স্ত্রী পূর্ব্বজন্মে ব্রজবাসী কায়স্থ ছিলেন এবং দম্পতিই ছিলেন। তাঁহারা ৺কাত্যায়নী পূজা করিয়া পরজন্মে দেবীকে কন্যারূপে পাইবেন এইরূপ কামনা করিয়াছিলেন।

কর্ণেল অলকট্‌কে যে এক মহাপুরুষ দর্শন দিয়াছিলেন এবং একটা পাগড়ী দিয়াছিলেন সে কথা সত্য।

১৩ই মাঘ তারিখে সুকুমারবাবুর ডায়েরীতে দেখা যায় ঐদিন শোভা বাড়ীর প্রত্যেকের গতজন্মের খবর প্রকাশ করেন, এবং কে কাহার শিষ্য ছিলেন তাহাও প্রকাশ করেন। ১৫ই মাঘ তারিখে শিশিরবাবু সুকুমারবাবুকে বলেন যে, শোভা তাঁহার নিকট নিজের একশত জন্মের কথা প্রকাশ করিয়াছেন। ঐ বিষয়ে সুকুমারবাবু রাত্রিতে শোভাকে প্রশ্ন করিলে তিনি বলিলেন, "হাঁ, চাহিয়া দেখিলাম বায়োস্কোপের পর্দ্দায় যেমন ছবির পর ছবি ফুটিয়া উঠে, তেমনি আমার শতজন্মের নাম, গ্রাম ও পিতা-মাতার ছবি পরপর ফুটিয়া উঠিল।"

দশ

সুকুমারবাবুদের কোণ্ডার বাড়ীতে, ১৩৪২ সালের ১৪ই ফাল্গুন তারিখে বাবাজী মহারাজের তৈলচিত্রের প্রতিষ্ঠা হয়। আবার শোভার জন্মদিনও ১৪ই ফাল্গুন, যদিও সেদিকে লক্ষ্য না করিয়াই তৈলচিত্র প্রতিষ্ঠার দিন ঠিক করা হইয়াছিল। এবার (১৩৪৩) ১২ই কার্ত্তিক তারিখে বাবাজী মহারাজ জানাইয়াছিলেন যে শোভা পরবর্ত্তী ১৩ই ফাল্গুন মধ্যে পূর্ণ-ব্রহ্মজ্ঞতা লাভ করিবেন। শিশিরবাবুর ডায়েরীতে দেখা যায় যে, সেইজন্য ১২ই কার্ত্তিক তারিখেই প্রস্তাব হইয়াছিল যে, এবার ১৪ই ফাল্গুন গুরু মহারাজের তৈলচিত্র-প্রতিষ্ঠার বার্ষিক উৎসব সমারোহসহকারে করিতে হইবে। ঐ দিন শোভা শিশিরবাবুকে বলেন, "ভাইদা, এবার সেই পূর্ণব্রহ্মজ্ঞ মেয়েটিকে আনিতে হইবে।"

১৫ই ফাল্গুন (১৩৪৩)। স্থান কোণ্ডা। উৎসব চলিতেছে। অভ্যাগতদিগের মধ্যে গোকর্ণ হাইস্কুলের একজন শিক্ষক "যত মত তত পথ" সম্বন্ধে শোভার সহিত কিছু তর্ক করেন। শোভা এই মতটির দোষ এইভাবে বুঝাইয়া দেন;—কলিকাতা পৌঁছিবার হাজার পথ থাকিতে পারে, তাই বলিয়া দেশে যতগুলি পথ আছে সবগুলিই কলিকাতায় পৌঁছে না।

১৯শে ফাল্গুন নগরকীর্ত্তনে শোভা ভাবস্থ হইয়া কীর্তন

করেন। ভাব তিন ঘণ্টা ছিল। শোভা যখন মাঝে মাঝে ত্রিভঙ্গ হইয়া বলিতেছিলেন, "একবার তোরা হরি বল," তখন জনতার চক্ষু জলে ভাসিয়া যাইতেছিল এবং বাড়ীর সকলে কাঁদিয়া আকুল হইয়াছিলেন। সুকুমারবাবু ডায়েরীতে লিখিয়াছেন, "এমন প্রাণমাতান কীর্তন কেহ আর দেখে নাই।"

এই উৎসব উপলক্ষ্যে একদিন ঐ অঞ্চলের এক বর্ষীয়ান্, সুপণ্ডিত ও প্রতিষ্ঠাসম্পন্ন পাঠক ভাগবত পাঠ করেন। তিনি এই বলিয়া পাঠ আরম্ভ করেন যে ভাগবত এরূপ সুগম্ভীরার্থক শাস্ত্র যে, স্বয়ং ভগবান্ বলিয়াছেন, ভাগবতের মর্ম "অহং বেত্তি শুকো বেত্তি ব্যাসো বেত্তি ন বেত্তি বা"—আমি জানি, শুক জানে, ব্যাস জানে কি জানে না। এই কথাগুলি মায়ের ভাল লাগে নাই। সেই জন্য তিনি পাঠারম্ভের অল্পক্ষণ পরেই পাঠের আসর হইতে উঠিয়া যান। তিনি ফিরিতেছিলেন না দেখিয়া শ্রীশ্রীবাবাজী মহারাজের শিষ্য এবং মায়ের প্রতিও শ্রদ্ধাসম্পন্ন শ্রীযুক্ত শশাঙ্ক ভট্টাচার্য্য * মহাশয় মায়ের নিকট যাইয়া বলেন, "মা; একজন দেশমান্য বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ পাণ্ডিত পাঠ করিতেছেন, সেখান হইতে তোমার উঠিয়া আসা ভাল দেখায় নাই; তুমি আবার চল।" তাঁহার কথায় মা ফিরিয়া আসেন এবং পাঠ শেষ হইলে পণ্ডিত মহাশয়কে বলেন, "ঐ যে বচনটি যাহাতে বলা হইয়াছে ভাগবতের মর্ম্ম শুক জানেন, ব্যাস জানেন কি জানেন না উহার মূল কি?"

---

* এই ব্যাপারের বিবরণ ইঁহারই মুখে আমি শুনিয়াছি।

পণ্ডিত। বচনটি কোথায় আছে তাহা ঠিক জানি না। তবে উহা ঋষিপ্রণীত শাস্ত্র হইতেই উদ্ধৃত তাহাতে সন্দেহ নাই।

মা। অন্য লোকের রচিতও ত হইতে পারে।

পণ্ডিত। না; ঋষিভিন্ন কেহ "অহং বেত্তি" এইরূপ লৌকিক ব্যাকরণ-দুষ্ট ভাষা প্রয়োগ করিতে সাহসী হইত না।

মা। ভাগবত যিনি রচনা করিয়াছেন তিনি উহার মর্ম্ম জানেন না, তাঁহার পুত্র জানেন এটা কেমন কথা?

পণ্ডিত। ব্যাস হইতে শুকদেব যে আধ্যাত্মিক বিষয়ে উন্নততর ছিলেন ইহা ত সর্ব্বজনবিদিত।

মা। প্রমাণ?

পণ্ডিত। প্রমাণ এই যে, একদা কয়েকটি অপ্‌সরা এক বনমধ্যবর্ত্তী সরোবরে বিবসনা হইয়া জলক্রীড়া করিতেছিল, সেই সময়ে শুকদেব সেই সরোবরের তীর দিয়া চলিয়া যান। তাঁহাকে দেখিয়া অপ্‌সরারা কিছু মাত্র লজ্জাবোধ করে নাই। কিয়ৎক্ষণ পরে যখন ব্যাসদেব সেই পথে আসেন, তখন দূর হইতে তাঁহাকে দেখিয়া তাহারা দ্রুত বসনাদি দ্বারা অঙ্গ আবৃত করে। ইহা কি শুকদেবের অধিক মহাত্ম্যজ্ঞাপক নয়?

মা। নাও হইতে পারে। শুক ছিলেন শুদ্ধসত্ত্বগুণান্বিত পুরুষ। তাঁহার সত্ত্বগুণের প্রভাবে অপ্‌সরাদিগের চিত্তে লজ্জা-

জনিত চাঞ্চল্য হয় নাই। আর ব্যাস ছিলেন ত্রিগুণাতীত পুরুষ, তাঁহাকে দেখিয়া পুরুষমাত্রবোধে অপ্সরারা স্ত্রীলোকের স্বাভাবিক সংস্কার অনুসারে লজ্জা বোধ করিয়াছিল।

মায়ের হৃদয়গ্রাহী যুক্তি শুনিয়া পণ্ডিত মহাশয়ও কিঞ্চিৎ মুগ্ধ হইয়া থাকিবেন। তিনি তাহার উপরে কোনও কথা বলেন নাই।

এই মাসের শেষাশেষি সুকুমারবাবু ডায়েরীতে মন্তব্য করিতেছেন, "শোভা ইদানীং ঊষা-প্রভৃতির সঙ্গে খুব খেলা ধূলা করে। দেখিলে মনে হয় না যে, সে আধ্যাত্মিক জগতে এতখানি অগ্রসর হইয়াছে।" তিনি শোভাকে প্রশ্ন করেন, "শোভা, তোমার বর্ত্তমান অবস্থাটা কিরূপ বল।"

শোভা। এখন সেই আনন্দবোধটা সর্ব্বক্ষণই চল্‌ছে।

সুকুমারবাবু। তবে যে মাঝে মাঝে এই সব ক্ষেপা-ক্ষেপি কর দেখিতে পাই সেগুলি কি?

শোভা। সেটা বাহ্যিক।···দুইটা অবস্থাই একসঙ্গে চলিতে পারে।

ইহার পূর্ব্বে একদিন (১৭ই মাঘ) সুকুমারবাবু বলিয়াছিলেন "১৮ই ফাল্গুন তোমার কাছে একটা কিছু চাইব। আমাদের তা দিতে হবে।"

শোভা। কি?

সু। শক্তি-সঞ্চার।

শো। কিছু হয় না তা'তে। এই ধর এই শিশুকে তুলিয়া যদি ঐ (ছবির) ফ্রেমটা ধরিতে দিই, সে তৎক্ষণেই উহা ছুঁইয়া

থাকিতে পারিবে, যতক্ষণ আমি উহাকে ধরিয়া থাকিব। ছাড়িয়া দিলে আর নাগাল পাইবে না। শুধু যে একবার নাগাল পাইয়াছিল তাহাই মনে থাকিবে। লাভ কিছুই হইবে না।

৭ই চৈত্র রাত্রি বারটায় বরকান্তায় মিসেস্ জেনিংস্ (Mrs. Roorna jennings) শোভাকে দেখিতে যান। তিনি মার্কিন-দেশীয়া মহিলা, কলিকাতায় বিশ্বধর্ম্মসম্মেলন উপলক্ষ্যে এদেশে আসিয়াছেন। তিনি ঐ সম্মেলনের সভপতি সার্ ফ্রান্সিস্ ইয়ংহাজ্ ব্যাণ্ডের মুখে শোভার "remarkable spiritual attainments" এর খবর পাইয়া তাঁহার সহিত সাক্ষাৎকারের অভিপ্রায় জানাইয়া সুকুমারবাবুকে এক পত্র লিখেন; পরে সুকুমারবাবুর সাদর আহ্বানে বরকান্তায় চলিয়া যান। আধুনিক জগতের সভ্যতম দেশের একটী সঙ্গতি-সম্পন্না মহিলার পক্ষে বাঙ্গালার পল্লী অঞ্চলের নানা অসুবিধা ও ভয় অগ্রাহ্য করিয়া কলিকাতা হইতে বরকান্তা পর্য্যন্ত গমন আধ্যাত্মিক বিষয়ে কতখানি উদগ্র আগ্রহের পরিচায়ক তাহা সহজেই অনুমান করা যায়। তবে ইহা যে জন্মান্তরীণ সুকৃতি-কর্তৃক নির্দ্দিষ্ট যোগা-যোগের ফল তাহা বুঝিতে কর্ম্মবাদী হিন্দুর কষ্ট হয় না। সে যাহা হউক বরকান্তা পৌঁছিবার পর রাত্রি প্রভাতে মিসেস্ জেনিংস্ সুকুমারবাবুর ঠাকুরঘরে গিয়া হাঁটু গাড়িয়া বাবাজী মহারাজ, ঠাকুরজী প্রভৃতির ছবিকে সম্মান প্রদর্শন করেন। পরে জল-খাবার খাইতে খাইতে তিনি নানা আধ্যাত্মিকতত্ত্ব সম্বন্ধে শোভাকে প্রশ্ন করিতে থাকেন। তাঁহার প্রশ্ন শোভাকে বাঙ্গালায় ও শোভার উত্তর তাঁহাকে ইংরাজীতে অনুবাদ করিয়া

দেওয়া হয়। কতকগুলি প্রশ্ন বাঙ্গালাতে অনুবাদ করিয়া দিতে হয় নাই, মেমের প্রশ্ন শুনিয়াই শোভা ঐগুলির উত্তর দিয়াছিলেন। ইহাতে মেম খুব বিস্মিত হইয়াছিলেন।

শোভার উত্তরে মেম খুব খুশী হন। ভোগনিবেদন করা হইলেন ছবির মুখে ভোগাংশ দেখিয়া তিনি বিস্মিত হন।

সদ্‌গুরুর জন্য তাঁহার খুব ব্যাকুলতা দেখা গিয়াছিল। গুরুকরণ সম্বন্ধে শোভা প্রথমে কোনও উত্তর দেন নাই। মেম খুব পীড়াপীড়ি করাতে তিনি বলেন, "আজ রাত্রিতে তুমি যেমন প্রেরণা পাবে সেইভাবে কাজ করবে।"

পরদিন (৯ই চৈত্র) সুকুমারবাবু প্রভৃতি শোভার আধারে গুরুজীর পূজা করিলেন। শোভার আবেশ সকল পূর্ব্ববৎ। মেম তাহা দেখিলেন। তারপর তিনি দীক্ষার জন্য প্রস্তুত হইলেন। উষা তিলক করিয়া দিলেন। শোভা ঠাকুরঘরে গিয়া মন্ত্র লিখিয়া আনিলেন। আরও দেখা গেল শোভা ঠাকুর ঘরে মালা হাতে লইয়া শূন্যে যেন কাহারও পায়ে উহা স্পর্শ করাইয়া লইতেছেন। ঐ সময়ে তাঁহার মুখে অপূর্ব্ব মৃদু হাসি দেখা গিয়াছিল। যথারীতি দীক্ষা হইল। মেমের নাম হইল সুলভা দাসী। তিনি গুরুপ্রণামী ত্রিশটাকা বাবাজী মহারাজের আসনের কাছে রাখিয়া ছবির পায়ে পুষ্পাঞ্জলি দিলেন এবং হাঁটু গাড়িয়া কৃতজ্ঞতা নিবেদন করিলেন।

১০ই চৈত্র প্রাতে মিসেস্ জেনিংস্ দেড়ঘণ্টা কাল জপ করিয়াছিলেন এবং কিছু কিছু অনুভবও করিয়াছিলেন বলিয়া সুকুমার-

বাবুর ডায়েরীতে লিখিত হইয়াছে। তিনি শোভার অনুমতি লইয়া অনুভূতিগুলি সুকুমারবাবুকে লিখিয়া দেখান।

ঐদিনই তিনি কুমিল্লা আসিলেন। সুকুমারবাবু, শোভা প্রভৃতিও তাঁহার সঙ্গে আসেন। সকালে শোভার জেঠা শ্রীযুক্ত বরদাবাবুর গৃহে যান। তথায় কুমিল্লার থিওসফিক্যাল সোসাইটির কয়েকজন সদস্যের অনুরোধে মিসেস্ জেনিংস্ শোভাকে কেমন দেখিলেন এই বিষয়ে মহেশ-প্রাঙ্গনে এক বক্তৃতা করেন। উহার এক বিবরণ অমৃতবাজার পত্রিকায় প্রকাশিত হইয়াছিল। মিসেস্ জেনিংস্ শাড়ী পরিয়া এবং তিলক কাটিয়া সভায় গমন করেন। শোভাই নিজের একখানি শাড়ী তাঁহাকে পরাইয়া দিয়াছিলেন। ঐদিন রাত্রিতে মিসেস্ জেনিংস্ কুমিল্লা ছাড়িয়া চলিয়া যান।

এই সকল ঘটনার বিবরণ প্রচার হওয়ায় নানাস্থানে নানামতের লোকের মধ্যে অতি স্বাভাবিক ভাবেই যেমন খুব একটা কৌতূহল উদ্দীপিত হইল, তেমনিই অনেকের মনে একটা বিরোধের ভাবও ধীরে ধীরে জমাট বাঁধিয়া উঠিতে লাগিল। ১২ই চৈত্র তারিখে শোভা আখাউড়ার নিকটবর্ত্তী গঙ্গাসাগর-নামক গ্রামে যান। সেদিন দোলপূর্ণিমা ছিল। বহু লোক শোভাকে দেখিতে আসেন এবং তাঁহার সঙ্গে ধর্ম্মবিষয়ক নানা তর্ক করেন। শোভা ঐ দিনের আলাপে সদ্‌গুরু হইতে লব্ধ দীক্ষার উপর খুব জোর দেন। ইহা গুরুতা ব্যবসায়ী কোন কোন ব্রাহ্মণের একেবারেই মনঃপূত হয় নাই। দেবতার পক্ষে স্থূলভোগ-গ্রহণও সম্পূর্ণরূপেই

অসম্ভাব্য ব্যাপার এইরূপ ধারণা হইতে অনেকে তদ্বিষয়ে নানা প্রশ্ন করেন এবং উহা যে সম্ভব তাহা শোভা তাঁহা-দিগকে বুঝাইতে চেষ্টা করেন।

বৈশাখ মাসের (১৩৪৪ সাল) গোড়ার দিকে সুকুমারবাবু একখানি চিঠিতে জানিতে পাইলেন একব্যক্তি অমৃতবাজার পত্রিকায় এই মর্ম্মে এক পত্র প্রকাশ করিয়াছেন যে, শোভা সন্তদাস বাবাজীর শিষ্যা নহেন। ইহাতে সুকুমারবাবুর মনে একটু ক্ষোভ জন্মে। কেন না শোভার নামগ্রহমের অনুষ্ঠান যথানিয়মেই হইয়াছিল, এবং শোভা নামপ্রাপ্তির পর দুইটি টাকা দিয়া যথানিয়মে গুরুকে প্রণাম করিয়াছিলেন। অনু-ষ্ঠানের কোনও অঙ্গই বাদ পড়ে নাই। এখন পত্রিকার স্তম্ভে লেখকবিশেষের স্বেচ্ছাকৃত সত্যাপলাপের সংবাদ পাইয়া সুকুমারবাবু এবং তৎসঙ্গে উষাও মনে করেন এইরূপ মিথ্যা-প্রচারের একটা প্রতিবিধান আবশ্যক। কিন্তু শোভাকে ঐ কথা বলা হইলে তিনি শুধু বলেন, "ইহাও গুরুজীরই খেলা।"

সুকুমারবাবুর মন এই উত্তরে প্রবোধ মানিল না। তিনি মনে মনে গুরুর কাছে অভিযোগ করিতে লাগিলেন। বিকালে স্কুলের ছুটির পর, তিনি বাসায় ফিরিয়া আসিলে শোভা তাঁহাকে ঠাকুরঘরে ডাকিয়া নিয়া বলিলেন, "বাবা বল্লেন, 'সুকুমারকে ব'লো সে এর জন্যে এত দুঃখ পায় কেন? কেউ যদি বলে যে সতু তার ছেলে নয়, তাতে সে রাগ করবে, না শুধু হাসবে?"

২৬শে বৈশাখ তারিখেও কয়েকটি গুরু-ভাইয়ের এবং আরও নানালোকের শোভার উপরে প্রথমে বিশ্বাস ও পরে অবিশ্বাসের বিষয় আলোচনা করিয়া সুকুমারবাবু মনে মনে খুব ক্ষুব্ধ হন এবং এই বিষয়ে সমুচিত একটা ব্যবস্থা করিবার জন্য শোভাকে বাবাজী মহারাজের নিকট তাঁহার প্রার্থনা জ্ঞাপন করিতে বলেন। শোভা প্রথমে সম্মত হন নাই, অনেক পীড়াপীড়ির পর তিনি সম্মত হন এবং ঠাকুরঘরে গিয়া বাবাজী মহারাজকে ঐ কথা নিবেদন করিয়া আসিয়া এই মর্ম্মে বলেন, "বাবা বল্লেন, 'দুইটা দল থাকবেই ; নচেৎ প্রকৃত বিশ্বাসীদের মনে মনে যে তৃপ্তিবোধ সেটা হয় না। যতটুকু প্রচারের প্রয়োজন তাহা আমিই করিব।"

১৯শে শ্রাবণ তারিখে সুকুমারবাবু প্রতিপক্ষের উত্তরোত্তর বর্দ্ধমান বিরোধিতায় অসহিষ্ণু হইয়া পুনরায় শোভাকে বলেন যে, তিনি যখন এরূপ অবস্থা লাভ করিয়াছেন যে, যাহা ইচ্ছা করিবেন তাহাই হইবে, তখন এই যে বিরোধিতা আত্মপ্রকাশ করিয়াছে এই সব দমন করিবার জন্য ইচ্ছা করিলেই ত হয়। ইচ্ছা করিতে দোষ কি ?

তদুত্তরে শোভা বলেন, "ইচ্ছা করিলেই তাহা হইবে বলিয়া যা' তা' ইচ্ছা করা হইয়া উঠে না। দেখ, তুমি স্কুলের হেড্‌মাষ্টার, ইচ্ছা করিলেই স্কুল ছুটি দিতে পার, দিলে ছাত্রেরা কত খুশী হয়। কিন্তু তুমি কি এই ভাবে স্কুল ছুটি দিয়া ফেলিতে ইচ্ছা কর ?"

এগার

এখন হইতে আমরা আর সুকুমারবাবুর বা শিশিরবাবুর ডায়েরী অনুসরণ করা আবশ্যক মনে করি না। শোভা মায়ের সাধনাবস্থা-সম্বন্ধে বাহিরের লোকের কৌতূহলনিবৃত্তির পক্ষে যথেষ্ট বিবরণই প্রদত্ত হইয়াছে বলিয়া মনে করি। ১৮ই ফাল্গুন তাঁহার সাধনাবস্থার পূর্ণ পরিণতি হয়। এই সময়ে তাঁহার পরমকৃপাময় গুরু তাঁহার জ্ঞানের সকল আবরণ অপসারিত করেন। তদবধি আর কোনও বিষয় জিজ্ঞাসিত হইয়া উত্তরের জন্য তাঁহার ধ্যানস্থ হওয়ার প্রয়োজন হয় না। সুকুমারবাবু এবং শিশিরবাবু সুবিবেচনার ফলে শোভা মায়ের সাধনাবস্থার অনেক -তথ্যই সাধারণের গোচরে আসিবার পথ পাইয়াছে। অবশ্য ইহাও তাঁহাদের গুরুরই ইচ্ছায় হইয়াছে এবং তাহার প্রমাণও ডায়েরীর মধ্যেই আছে। শোভা মায়ের পূর্ব্বজন্মের অটল সাধনার পুরস্কারদানের উদ্দেশ্যে অথবা তাঁহার দ্বারা জগতের কোনও মহোপকার সাধনের অভিপ্রায়ে ভগবান্ তাঁহাকে এইভাবে অতিদ্রুত এবং অসাধারণপ্রকারে আধ্যাত্মিক উন্নতির চরমাবস্থায় প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন তাহা একমাত্র তিনিই এবং শোভা মায়ের গুরুজীই জানেন। তাঁহাকে লোকসমাজে প্রচার করিবার কোনও বিশেষ চেষ্টা এ পর্য্যন্ত হয় নাই। তাঁহার গুরুদেব বলিয়াছেন, “যতটুকু প্রচারের প্রয়োজন তাহা আমিই করিব।” কার্যতঃ হইতেছেও তাহাই। ধীরে, অতিধীরে কোন ব্যক্তিবিশেষ

বা সঙ্ঘ-কর্ত্তৃক পরিকল্পিত বা নিয়ন্ত্রিত চেষ্টাব্যতিরেকেই পূর্ববঙ্গের সুদূর এক পল্লী হইতে বাঙ্গালা দেশের নানা অঞ্চলে এবং বাঙ্গালার বাহিরেও নানাস্থানে এই বালিকা ব্রহ্মজ্ঞার নাম ও মাহাত্ম্যের কথা কৌতূহলী লোকের কর্ণে পোঁছিতেছে এবং কাহারও কাহারও হৃদয়ও স্পর্শ করিতেছে। শ্রীভগবানের সকল ব্যবস্থার মতই ইহা নিয়তক্রমেই হইতেছে। ভগবান্‌কে লইয়া মাতামাতিতে শোভা-মাতে নাই; কেননা তাঁহার শিক্ষা হইতেছে জ্ঞানমিশ্র ভক্তিযোগ বা ভক্তিমিশ্র জ্ঞানযোগ—যাহাতে কোনও মাতামাতি থাকিতে পারে না। মাতামাতি দ্রুত প্রচারের একটা সুপরীক্ষিত সহজ উপায় হইলেও, এ ক্ষেত্রে তাহা অচল। জ্ঞানিশ্রেষ্ঠ সুধীরপ্রকৃতি মহামহোপাধ্যায় গোপীনাথ কবিরাজ শোভা মাকে কাশীতে লইয়া গিয়া তাঁহার মুখে বিবিধ তত্ত্বকথা স্বয়ং শুনিবার ও জিজ্ঞাসু জগৎকে শুনাইবার যে পরিকল্পনা করিয়াছিলেন, তাহা যে শোভা মাকে প্রচার করিবার পক্ষে অনুকূল ছিল তাহাতে সন্দেহ নাই; কিন্তু যে কারণে সে পরিকল্পনা কার্য্যে পরিণত হইতে পারে নাই তাহা পূর্ব্বেই উল্লিখিত হইয়াছে। তথাপি কাশী-যাতায়াতের পথে শোভা মাকে যে কিঞ্চিদধিক দেড়মাসকাল কলিকাতায় থাকিতে হইয়াছিল, তাহাতে বহু জিজ্ঞাসু লোক তাঁহার সংস্পর্শে আসিবার সুযোগ এবং আশা করা যায়, স্ব স্ব অধিকার-অনুসারে কিছু কিছু উপকারও পাইয়াছে। ইহা মহামহোপাধ্যায় গোপীনাথ কবিরাজেরই শুভ সঙ্কল্পের একটি অবান্তর সুফল

বলিয়া অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে।

কলিকাতায় শোভা মাকে যাঁহারা দেখিতে আসিতেন তাঁহাদের মধ্যে অপেক্ষাকৃত অল্পসংখ্যক লোকই তত্ত্বজিজ্ঞাসু ছিলেন। ইঁহাদের সঙ্গে শোভা মায়ের যে আলাপ-আলোচনা হইয়াছে, তৎসম্বন্ধে সাধারণভাবে বলিতে গেলে ইহাই বলা যায় যে, তিনি নিম্বার্কসম্প্রদায়সম্মত দ্বৈতাদ্বৈতবাদ বা ভেদাভেদবাদই সমর্থন ও ব্যাখ্যা করিতেন। তাঁহার গুরু ৺সন্তদাস বাবাজী মহারাজ ঐ সম্প্রদায়েরই লোক ছিলেন এবং নানাপুস্তকে ঐ সম্প্রদায়ের মতাবলী ব্যাখ্যা করিয়াছেন। অবশ্য গুরু-শিষ্য পরম্পরাক্রমে এবং ব্যক্তিগত প্রতিভা বা অনুভূতির বৈশিষ্ট্য-অনুসারে সাম্প্রদায়িক মতের মধ্যে কিছু কিছু ভেদসৃষ্টি হইতে থাকে। তাহা হইতেই সম্প্রদায়মধ্যে শাখা-প্রশাখার উদ্ভব হয়। প্রায় সকল সম্প্রদায়েই ইহা হইয়াছে। বাবাবী মহারাজ যেমন ভিন্ন সম্প্রদায়ের লোকদের সঙ্গে তর্ক করিয়া স্বমত স্থাপন করিতে চেষ্টা করিতেন সেইরূপ স্ব-সম্প্রদায়েরও বহু লোকের সহিত তর্ক করিয়া তিনি যাহা নিম্বার্কসম্প্রদায়ের খাঁটি মত বলিয়া মনে করিতেন সেই মতে তাঁহাদিগকে আনিবার চেষ্টা করিতেন। কাজেই শোভা মা নিম্বার্কসম্প্রদায়-সম্মত মতাবলীই ব্যাখ্যা বা প্রচার করেন এ কথা বলিলে বিশেষজ্ঞের কাছে তাহার মূল্য অধিক হয় না। বাবাজী মহারাজের মতাবলী হইতেও তাঁহার মতাবলী কোনও কোনও বিষয়ে বৈশিষ্ট্যযুক্ত কি না তাহাও বিশেষজ্ঞগণের পরীক্ষণীয়। এই পুস্তকের অধিকাংশ পাঠকের

পক্ষে বোধ করি এই পর্য্যন্ত জানাই যথেষ্ট যে, শোভার বিদ্যার অতি সামান্য অংশও পুস্তক হইতে লব্ধ নয়, কেননা বস্তুতঃ তিনি কোনও পুঁথিই তেমনভাবে পড়েন নাই। আর তাঁহার পরিপার্শ্বস্থ কোনও ব্যক্তি দর্শন বা সাধনশাস্ত্রে এরূপ নিষ্ণাত নহেন যাহাতে এমন অনুমান করা সঙ্গত হইবে যে, এই সপ্তদশ-বর্ষবয়স্কা বালিকা তাঁহার মুখে শুনিয়া শুনিয়া অধ্যাত্মজগতের উচ্চ, উচ্চতর, উচ্চতম তত্ত্বগুলি এমনভাবে আয়ত্ত করিয়া ফেলিয়াছেন যে, যে-কোনও জিজ্ঞাসুর যে-কোনও প্রশ্নের শাস্ত্রসম্মত ও সাধকগণের অনুভূতিসমর্থিত উত্তর এক মুহূর্ত্তের জন্যও না ভাবিয়া না চিন্তিয়া দিতে পারেন। সত্য তাঁহার সত্ত্বোজ্জ্বল চিত্তে যেমন প্রতিভাত হয় তিনি সেইরূপ বলিয়া যান। তাহাতে দুর্ব্বোধ্যতা কিছু নাই। অতি কঠিন তত্ত্বও তাঁহার ব্যাখ্যায় অনেকটা সরল হইয়া যায়। সুকুমারবাবু তাঁহার ডায়েরীতে একস্থানে (১৩৪৪ সালের ২৯শে শ্রাবণ তারিখে) লিখিতেছেন যে, তিনি "গুরু-শিষ্য-সংবাদ" হইতে দ্বৈতাদ্বৈতবাদ পড়িতেছিলেন, কিন্তু কিছুই তেমন বোধগম্য হইতেছিল না। "শোভা আমাকে মতবাদটি বুঝাইয়া দিলে কতক বুঝিলাম মনে হইল। বই পড়িয়া বুঝিতেছিলাম না।" অথচ সুকুমারবাবু একজন সুশিক্ষিত ব্যক্তি। অধ্যয়ন ও দর্শনের মধ্যে এই প্রভেদ।

ধর্ম্মবিষয়ে কিছু বলিতে গেলেই সকল কথা সকল সম্প্রদায়ের মনঃপূত হয় না; যেখানে মতান্তর সেইখানেই রেষারেষি। শোভা মাকে এই রেষারেষির সম্ভাবনা সর্ব্বদা বর্জ্জন করিয়া

চলিতে দেখিয়াছি, কিন্তু তাঁহার চিত্তে প্রতিভাত সত্য কখনও বর্জ্জন করিতে দেখি নাই।

সাধুর নাম শুনিলেই এক শ্রেণীর লোক তুরারোগ্য ব্যাধির ঔষধের জন্য ছুটিয়া আসেন। এরূপ বহু লোকও আমার বাড়ীতে শোভা মায়ের নিকট আসিয়াছেন, এবং সাধারণতঃ নির্জ্জনে সাক্ষাতের অনুরোধ করিয়া সেইভাবে দেখাও করিয়াছেন। শোভা মা এ বিষয়ে কাহারও কোনও অনুরোধ রক্ষা করেন নাই। তিনি সকলকেই বলিয়াছেন, "আমি কাহাকেও ঔষধ দেই না।" রোগ সারিবে কি সারিবে না এরূপ প্রশ্নেরও কোনও উত্তর তিনি দিতেন না। অন্যবিধ বৈষয়িক ব্যাপারের ভাবী ফলাফল সম্বন্ধেও তাঁহার ঐ এক ভাব দেখা যাইত।

শোভা মা কাহারও কাহারও পূর্ব্বজন্মের কথা ব্যক্ত করিয়াছেন শুনিতে পাইয়া অনেকে তাঁহাকে সজনে ও নির্জ্জনে নিজ নিজ পূর্ব্বজন্মবৃত্তান্ত জিজ্ঞাসা করিয়াছেন। শোভা মা বলিয়াছেন, "আমি জানি, কিন্তু বলিব না।" বলিলে উত্তর যে প্রীতিকর নাও হইতে পারে একথা বোধ করি জিজ্ঞাসুদের মনে হয় নাই। সকলেই হয়ত ভাবেন তিনি পূর্ব্বজন্মে রাজা বা রাজপুত্র বা ঐরূপ মহিমান্বিত একটা কিছু ছিলেন, সামান্য কোনও ত্রুটির জন্য এজন্মে কষ্ট পাইতেছেন। আমি একদিন পরিহাসপূর্ব্বক বলিয়াছিলাম, মা যদি কাহাকেও বলিয়া দেন, তুমি পূর্ব্বজন্মে ছাগল ছিলে, তাহা হইলে বোধ করি আর কেহ

ঐরকম প্রশ্ন লইয়া তাঁহাকে বিরক্ত করিতে আসিবে না।

কলিকাতা হাইকোর্টের একটি এড্‌ভোকেট একদিন স্বীয় পূর্ব্বজন্মবৃত্তান্ত বলিবার জন্য মাকে খুব পাড়াপীড়ি করেন। মা বলেন, "আমি বলিলেই কি বিশ্বাস হইবে?" তখন ভদ্রলোক বোধ করি সেই কথার সারবত্তা উপলব্ধি করিয়া বলিলেন, "তবে আমার এই জন্মের এমন একটা কিছু ব্যাপারের কথা বলুন যাহা আমার খুব আপনজন ব্যতীত অন্যে জানে না। এইরূপ না বলিলে আপনাতে আমার বিশ্বাস জন্মিবে কেন?" শোভা মা বলিলেন, "বিশ্বাস নাই বা জন্মিল, তাহাতে ক্ষতি কি?" কিন্তু এড্‌-ভোকেটটি ছাড়িবার পাত্র নহেন; তিনি বারবার জিদ ও পীড়াপীড়ি করিতে লাগিলেন। তখন শোভা মা তাঁহাকে সন্ধ্যারতির পর আসিতে বলেন এবং ঐ সময়ে তাঁহাকে নির্জ্জন প্রকোষ্ঠে নিয়া কিছু স্মরণ করাইয়া দেন। ভদ্রলোক বাহিরে আসিয়া কাহাকেও কোনও কথা বলেন নাই; কিছুক্ষণ নীরবে বসিয়া থাকিয়া চলিয়া যান।

বিশ্ববিদ্যালয়ের পোষ্ট গ্রাজুয়েট শ্রেণীর অনেক ছাত্র মাকে দেখিতে আসিয়াছেন এবং প্রশ্ন জিজ্ঞাসা ও তর্কও করিয়াছেন। অনেক সময় দুঃখ হইয়াছে আমাদের ছেলেরা বি. এ. পাশ করিয়াও সকলে সংযত ও ভদ্রসমাজ-সম্মত ভাষায় তর্ক করিতে জানে না। অধ্যাপক ডক্টর মহেন্দ্রনাথ সরকার উপস্থিত থাকিলে এরূপ ক্ষেত্রে অনেকের প্রশ্ন সংযতভাষায় অনুবাদ করিয়া দিতেন,

এবং সময় সময় নিজ স্বভাবসিদ্ধ সৌজন্যসহকারে কুতর্ককারীকে তর্ক হইতে নিরস্তও করিতেন।

কাহারও কাহারও ভাব দেখিয়া মনে হইত যেন তাঁহারা মাকে অপমান করিবার উদ্দেশ্য নিয়াই আসিতেন। কেহ কেহ মতের মিল না হইলে গরম হইয়া উঠিতেন। মাকে কিন্তু কখনও মুহূর্ত্তের জন্যও বিরক্ত বা গরম হইতে দেখা যায় নাই। স্পষ্ট অপমান-সূচক প্রশ্নের উত্তর তিনি প্রফুল্লমুখে দিয়াছেন; কোনও অপমান যে তাঁহার মন স্পর্শ করিয়াছে এরূপ অনুমান করিবার কোনও হেতু তাঁহার আকারে বা বাক্যে কখনও লক্ষিত হয় নাই।

অপর দিকে তাঁহার গুণমুগ্ধ ব্যক্তিগণের সংখ্যাও অল্প ছিল না। ইঁহারা অনেকে প্রায় প্রত্যহ তাঁহার মুখে ধর্ম্মকথা শ্রবণ করিতে আসিতেন। সকল বর্ণের ও সকল বয়সের ভব্য শ্রোতৃগণের মধ্যে অনেকেই উপদেশ-শ্রবণান্তে শোভা মায়ের নিষেধ বা অত্যন্ত সঙ্কোচসত্ত্বেও পাদস্পর্শ করিয়া তাঁহাকে প্রণাম করিয়া যাইতেন। অল্পক্ষণের জন্যও ব্যজনাদির দ্বারা তাঁহার কিঞ্চিৎ সেবা করিতে পারিলে কত ব্যক্তি যে কৃতার্থ হইতেন তাহা বলা যায় না। তাঁহার ঠাকুরজী ও বাবাজী মহারাজের সেবার্থ কত জন কত ফল মিষ্টান্ন ইত্যাদি আনিয়া দিতেন এবং প্রসাদ পাইয়া আপনাদিগকে ধন্য মনে করিতেন তাহার ইয়ত্তা নাই। আরতির সময় ঠাকুরদের অনতিক্ষুদ্র প্রকোষ্ঠে ও তাহার বাহিরেও ভদ্রলোক ও ভদ্রমহিলাগণের ভিড় হইত।

কয়েকবৎসর পূর্ব্বে কালাজ্বরে আক্রান্ত হওয়ার ফলে শোভা মায়ের মুখে ব্রণের মত কতকগুলি উদ্ভেদ ছিল। ক্যাম্পবেল হাসপাতালের ডাঃ হেমেন্দ্র বক্সী মহাশয় তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিয়া একজন চর্ম্মরোগের বিশেষজ্ঞ ডাক্তার দ্বারা উহা পরীক্ষা করাইতে আমাকে উপদেশ দেন। আমি প্রথমতঃ স্কুল অব ট্রপিক্যাল মেডিসিনের ডাক্তার গুণেন্দ্রনাথ সেনগুপ্তকে অনুরোধ করায় তিনি সৌজন্যপ্রদর্শনপূর্ব্বক আসিয়া দেখিয়া যান এবং উদ্ভেদগুলি কালাজ্বরেরই ফল (Leishmaniases) বলিয়া নির্দ্দেশ করেন। তৎপর আমার স্নেহভাজন আত্মীয় ডাঃ অমিয়ভূষণ সেন, এম্. বি., স্কুল অব ট্রপিক্যাল মেডিসিনেরই বিশেষজ্ঞ ডাক্তার কালীপদ বন্দ্যোপাধ্যায়কে সঙ্গে করিয়া আনিয়া শোভা মাকে পরীক্ষা করান এবং তাঁহার উপদেশ মতে নিজে কয়েকটি ইন্‌জেক্‌সন দেন। ইহাতেই ঐ উদ্ভেদগুলি ধীরে ধীরে লুপ্ত হয়। এইরূপে আরও নানাভাবে নানা গুণী ও জ্ঞানী লোক তাঁহার প্রতি অনুরাগ ও শ্রদ্ধা প্রদর্শন করিয়াছেন। প্রসিদ্ধ গায়ক এবং ভক্ত শ্রীযুক্ত (অধুনা পরলোকগত) ব্রজেন্দ্রকুমার গাঙ্গুলী একদিন স্বীয় দলসহ আসিয়া কীর্ত্তন করেন। অন্য এক দিন কলিকাতার বৈষ্ণব সমাজে সুপরিচিত সাধক, সুবক্তা ও সুগায়ক শ্রীযুক্ত অজিতকুমার ভক্তিবাচস্পতি স্বদলসহ আসিয়া পদাবলীপাঠ ও কীর্ত্তন দ্বারা সকলের আনন্দবর্দ্ধন করেন। তৎপূর্ব্বে ইনি এক দিন আসিয়া মায়ের সঙ্গে কিছুক্ষণ তত্ত্বালোচনাও করিয়াছিলেন। রায় বাহাদুর

খগেন্দ্রনাথ মিত্রও একদিন মাকে স্বভবনে নিয়া শ্রীযুক্ত নবদ্বীপচন্দ্র ব্রজবাসীর কয়েকটি ছাত্রীর দ্বারা কীর্ত্তন করাইয়া মা ও আমাদিগকে আনন্দদান করিয়াছিলেন। গায়িকাদিগের মধ্যে রায় বাহাদুরের দুইটি সুগায়িকা কুমারী কন্যাও ছিলেন। ইঁহারা একাধিক দিন পিতার সঙ্গে আমার গৃহে আসিয়া মাকে কীর্ত্তন শুনাইয়াছেন।

কয়েকটি ভক্ত শোভা মা হইতে এই সময়ে দীক্ষা গ্রহণ করেন, এবং কয়েকজন নাম পান। দীক্ষাপ্রাপ্ত ব্যক্তিগণের মধ্যে পূর্ব্বে উল্লিখিত শ্রীমান্ মতিলাল দত্ত ও তাঁহার পত্নী, শ্রীযুক্ত জিতেশচন্দ্র চক্রবর্ত্তীর মাতা এবং আরও একজন সম্ভ্রান্তবংশীয়া বিধবা ব্রাহ্মণমহিলা উল্লেখযোগ্য। এই মহিলাটির পুত্র শ্রীশ্রী৺বিশুদ্ধানন্দ পরমহংসদেবের শিষ্য এবং তিনি নিজেও তাঁহার নিকট দীক্ষা প্রার্থনা করিয়াছিলেন। সর্ব্বজ্ঞ পরমহংসদেব নিজে দীক্ষা না দিয়া বলেন, "জগদম্বা তোমাকে দীক্ষা দিবেন, ব্যস্ত হইবার কারণ নাই।"

শোভা মা যখন আমার বাড়ীতে ছিলেন ঐ সময়ে তাঁহার শিষ্যা শ্রীমতী সুমতি বন্দ্যোপাধ্যায় (ঊষা মার ভগিনী) গুরুতর পীড়ায় অত্যন্ত পীড়িতা হইয়া চিকিৎসার্থ ময়মনসিংহ হইতে কলিকাতা আসেন এবং আমার গৃহেই থাকেন। তিনি সেবার আই. এ. পরীক্ষার্থিনী ছিলেন। কিছু দিন মধ্যেই আরোগ্যলাভ করিয়া তিনি পরীক্ষা দিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। পরীক্ষার অন্তে শিশিরবাবুর উপদেশে মায়ের কোনও শিষ্যের প্রদত্ত অর্থে

ঠাকুরের জন্য কিছু শ্বেত-প্রস্তরের বাসন ক্রয় করিবার উদ্দেশ্যে একদিন দ্বিপ্রহরে উষা মা সহ সুমতি কালীঘাট যাইতে প্রস্তুত হন। শোভা মাকে ঐ বিষয়ে উঁহারা পূর্ব্বে কিছু বলেন নাই, বরং মধ্যাহ্নভোজনের পর তিনি নিদ্রিত হইলে তাঁহাকে না জানাইয়া চুপি চুপি যাইবার উদ্যোগ করেন। তাঁহারা বাটীর বাহির হইতে প্রস্তুত হইয়াছেন এমন সময় শোভা মা জাগিয়া বলেন, তিনিও তাঁহাদের সঙ্গে যাইবেন এবং সত্বর প্রস্তুত হইয়া বাহিরে আসেন। আশ্চর্য্যের বিষয় অসময় হইলেও ঐ মুহূর্ত্তে একটি ভদ্রলোক শোভা মায়ের দর্শনার্থী হইয়া গৃহদ্বারে উপনীত হন। ভদ্রলোকটি মোটর গাড়ীতে আসিয়াছিলেন; শোভা মা কালীঘাটে যাইবেন শুনিয়া তিনি বলিলেন, "দয়া করিয়া আমার গাড়ীতেই আপনারা চলুন; আমি কালীর একজন সেবায়েৎ, আজ আমারই পালা।" ভদ্রলোকটির নাম এখন ভুলিয়া গিয়াছি। তাঁহার আদর-আপ্যায়নে শোভা মা প্রভৃতি তাঁহার গাড়ীতেই গেলেন; তিনিও তাঁহাদিগকে মন্দিরে নিয়া মন্দির খালি করিয়া সমাদরপূর্ব্বক ৺কালী দর্শন করাইলেন এবং তৎপরে স্বগৃহে তাঁহাদিগকে নিয়া কিছুক্ষণ আলাপাদি করিয়া পাথরের বাসনের দোকানে পৌঁছাইয়া দিলেন। শ্রীমতী সুমতি যখন বাসন দেখিতেছিলেন ঐ সময়ে শোভা মার চক্ষু ঐ দোকানেই এক আলমারীতে এক জোড়া শ্বেত-প্রস্তরের রাধাকৃষ্ণ মূর্ত্তির উপর পড়ে এবং মূর্ত্তি দুইটি তাঁহার বড়ই মনোরম বোধ হয়। মূল্য জিজ্ঞাসা করাতে দোকানদার উহার মূল্য নব্বই কি

পঁচানব্বই টাকা বলে। বাড়ীতে ফিরিয়া আসিয়া মা সকলের নিকটই ঐ বিগ্রহদ্বয়ের রূপের প্রশংসা করিতে লাগিলেন। তাঁহার অত উচ্ছ্বসিত প্রশংসা শুনিয়া শ্রীমান্ (ডক্টর) স্থরেশচন্দ্র দেব বলিলেন, "মূর্ত্তি কিনিয়া ফেল, দামের জন্য চিন্তার প্রয়োজন নাই।" পরদিন শোভা মা শ্রীমান্ স্থরেশকে, আমাকে এবং বাটির অনেককে সঙ্গে করিয়া নিয়া মূর্ত্তিদ্বয় দেখাইলেন। বাস্তবিকই উহা অত্যন্ত স্থন্দর ছিল। ইতিমধ্যে দোকানের মালিকও শোভা মায়ের কিঞ্চিৎ পরিচয় পাইয়াছিল। সে আশী টাকা মূল্যেই উহা মায়ের কাছে বিক্রয় করিতে সম্মত হইল এবং বলিল, "নিয়া যান, টাকা পরে দিবেন।"

স্থরেশ টাকা দিলেন। এই ডক্টর স্থরেশ দেবই শ্রীযুক্ত গোপীনাথের প্রথমবার বরকান্তাযাত্রায় সহযাত্রী হইয়াছিলেন। শোভা মা যে কয়দিন আমার বাড়ীতে ছিলেন, তিনি প্রত্যহ দুই বেলা আসিতেন এবং প্রসাদ পাইতেন। প্রসঙ্গক্রমে বলা যায় যে, ৺কালীর পূর্ব্বোক্ত সেবায়েৎ ভদ্রলোক আরও একদিন আসিয়া মাকে ৺কালীমন্দিরে ও স্বভবনে নিয়া গিয়াছিলেন।

মূর্ত্তিদ্বয় গৃহে আসিয়া বাবাজী মহারাজ ও ঠাকুরজীর আলেখ্যদ্বয়ের পার্শ্বেই স্থাপিত হইলেন এবং তাঁহাদের সঙ্গে তাঁহাদেরও ভোগ আরতি ইত্যাদি হইতে লাগিল। মূর্ত্তিদ্বয় যে দেখিয়াছিল সেই মুগ্ধ হইয়াছিল। মায়ের শিষ্য শ্রীযুক্ত অমূল্যরতন ঘোষ (ইনি বি, এন্, রেলওয়েতে চাকরী করেন, এবং কিছুদিন পূর্ব্বে বরকান্তা যাইয়া সপরিবারে মায়ের কাছে দীক্ষা

গ্রহণ করিয়াছিলেন) বিগ্রহদ্বয়ের অলঙ্কারনির্ম্মাণের জন্য আড়াই-শত টাকা দিলেন। এক মহিলা ঠাকুরের হস্তের রূপার বাঁশী ; আর এক মহিলা রূপার লাঠি গড়াইয়া দিলেন। আরও অনেকে পট্টবসনাদি নানাদ্রব্য দিলেন। অবশেষে বাগবাজারের অন্নদানিয়োগী লেনের ৺মনোমোহন ঘোষ মহাশয়ের পত্নী শ্রীযুক্তা অন্নপূর্ণা ঘোষ ও তাঁহারা কৃতী পুত্রগণ বহু অর্থ ব্যয় করিয়া স্বভবনে উক্ত বিগ্রহদ্বয়ের অভিষেক ও প্রাণপ্রতিষ্ঠাদি সম্পন্ন করিলেন। এতদুপলক্ষ্যে তাঁহারা বহু লোক নিমন্ত্রণ করিয়া ভূরিভোজনে সকলকে তৃপ্ত করিয়াছিলেন। কীর্তনেরও ব্যবস্থা হইয়াছিল। বর্ষীয়ান্ বৈষ্ণব পণ্ডিত ৺রসিকমোহন বিদ্যাভূষণ মহাশয় ভাগবতপাঠ ও সন্ধ্যায় ভক্তসম্মেলনে সভাপতিত্ব করেন। ডক্টর মহেন্দ্রনাথ সরকার, শ্রীযুক্ত মণীন্দ্রকিশোর চক্রবর্ত্তী প্রভৃতি বহু কৃতবিদ্য ব্যক্তি এবং শ্রীশ্রী৺সন্তদাস বাবাজীর কোনও কোনও শিষ্য ঐ সভায় বক্তৃতা করিয়াছিলেন। উক্ত বাবাজী মহারাজের লোকোত্তর চরিত্রই বক্তৃতার বিষয় ছিল। ৺মনোমোহন ঘোষ মহাশয় হাইকোর্টের উকিল ও বাবাজী মহারাজের পরমবন্ধু ছিলেন। তাঁহার পত্নী ও পুত্রগণের মধ্যে কেহ কেহ বাবাজীর মহারাজের শিষ্য। শিবপুর আশ্রম নির্ম্মিত হইবার পূর্ব্বে বাবাজী বৃন্দাবন হইতে কলিকাতায় আসিলে অনেক সময় মনোমোহনবাবুর গৃহে অবস্থান করিতেন।

এই উৎসবের আর একটি বিশেষ স্মরণীয় ও আনন্দদায়ক ঘটনা হইয়াছিল ঐদিন প্রাতঃকালে শ্রীশ্রীআনন্দময়ী মায়ের

কলিকাতায় আগমন এবং পূর্ব্বে কোনও খবর না দিয়া ষ্টেশন হইতে বরাবর অন্নদানিয়োগী লেনে গমন। শোভা মা ও শিশিরবাবু ইতঃপূর্ব্বে আনন্দময়ী মাকে উৎসব উপলক্ষ্যে আসিবার জন্য সবিনয়ে আহ্বান করিয়াছিলেন, কিন্তু তাঁহার কোথাও যাতায়াত পূর্ব্ব হইতে স্থির থাকে না বলিয়া তিনি কোনও প্রতিশ্রুতি দিতে পারেন নাই। সুতরাং তাঁহার আগমন একরূপ অপ্রত্যাশিত ছিল। দুই মায়ের ইতঃপূর্ব্বে আর চাক্ষুষ সাক্ষাৎকার হয় নাই। শ্রীশ্রীআনন্দময়ী মা ইহার কিছুকাল পূর্ব্ব হইতেই কোনও গৃহস্থের বাসগৃহে প্রবেশ করিতেছিলেন না। তিনি গলিতে দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া বিগ্রহদ্বয় দর্শন করিলেন। তাঁহাকে অপ্রত্যাশিতভাবে পাইয়া ভক্তগণ রাস্তার উপরেই তাঁহাকে ঘিরিয়া কিছুক্ষণ কীর্ত্তনানন্দ করেন। এবারে বালীগঞ্জে বিরলার ৺শিবমন্দিরে শ্রীশ্রীমা আনন্দময়ীর বাসস্থান নির্দ্দিষ্ট হইয়াছিল। তিনি বাগবাজার হইতে শোভা মাকে গাড়ীতে তুলিয়া সেইস্থানে নিয়া যান এবং তথায় তাঁহার সঙ্গে কিছুক্ষণ আলাপাদি করেন। ঐ আলাপের সময় আনন্দময়ী মায়ের কয়েকটি ভক্ত তথায় উপস্থিত ছিলেন। তাঁহাদের মধ্যে কেহ মাকে আধ্যাত্মিক বিষয়ে প্রশ্ন করিলে মা নিজে উত্তর না দিয়া শোভা মাকে উত্তর দিতে বলেন। উভয় মায়ের এই প্রীতি-সম্মেলন উপস্থিত সকলেরই অত্যন্ত আনন্দ-দায়ক হইয়াছিল। আনন্দময়ী মা ঐদিনই বিকালে কলিকাতা ত্যাগ করেন। তাঁহার কতিপয় ভক্ত (পুরুষ এবং মহিলা) তাঁহাকে হাবড়া ষ্টেশনে ট্রেণে উঠাইয়া দিয়া তাঁহারই আদেশে

বাগবাজারে আসিয়া নবপ্রতিষ্ঠিত বিগ্রহদ্বয়ের প্রসাদ পাইয়াছিলেন। আনন্দময়ী মায়ের গর্ভধারিণীও তাঁহাদের সঙ্গে ছিলেন।

ইং ১৯৩৯ সনের ২৬শে ফেব্রুয়ারী (বাং ১৩৪৫ সালের ১৪ই ফাল্গুন) এই উৎসব হয়। তদুপলক্ষ্যে ২৪শে ফেব্রুয়ারী (১২ই ফাল্গুন) শোভা মা আমার গৃহ হইতে স্বগণ সহ বাগবাজার যান। উৎসবান্তে মা কয়েকদিন ঐ গৃহে ছিলেন, তখন ঐ অঞ্চলের স্ত্রী-পুরুষ বহু লোক তাঁহার দর্শন ও তাঁহার উপদেশাদি শ্রবণ করিবার সৌভাগ্যলাভ করেন। ঐ গৃহ হইতে মা স্বীয় জননী-প্রভৃতি এবং বিগ্রহাদি সহ পটলডাঙ্গায় মুসলমান-পাড়া লেনে স্বীয় মাতুলদিগের বাসাবাড়ীতে চলিয়া যান। তথায়ও অনেকে গিয়া তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ ও তত্ত্বালাপ করিয়াছিলেন। ঐ বাটীতেই তাঁহার যুগল-বিগ্রহের দোল-যাত্রোৎসব সম্পন্ন হয়। উহার পরেই তিনি ঐ স্থান হইতেই বরকান্তা চলিয়া যান। এবারে আর তিনি আমার গৃহে ফিরিয়া আসিয়া থাকেন নাই। তাঁহার মাতামহ কিছুদিন পূর্ব্ব হইতেই পীড়িত ছিলেন। তাঁহার ও তদীয় সন্তানগণের ইচ্ছায়ই তাঁহাদের বাড়ীতে গিয়া তিনি অবস্থিতি করেন। তাঁহাকে কিয়ৎ-পরিমাণে সুস্থ করিয়া রাখিয়া মা বরকান্তা ফিরিয়া যান। শোভা মায়ের এক মাতুলও এম, বি, ডাক্তার। রোগ খুব কঠিন হইলেও অনেকে ভাবিয়াছিলেন এবারের মত মায়ের দাদামহাশয় টিকিয়া গেলেন। কিন্তু মা (স্বীয় জননীর

অগোচরে) বহুপূর্ব্বেই আমাদিগকে বলিয়াছিলেন তাঁহার দাদামহাশয় এবার রক্ষা পাইবেন না। তাহাই হয়। মায়ের এখান হইতে বরকান্তা প্রত্যাবর্ত্তনের কয়েক দিন পরেই তিনি পরলোকপ্রাপ্ত হন। মা বলিয়াছেন তাঁহার উচ্চগতি হইয়াছে।

মা কলিকাতা হইতে চলিয়া গেলে আমরা এবং তাঁহার অনেক ভক্ত আপনাদিগকে বড়ই নিঃসঙ্গ ও নিরানন্দ বোধ করিয়াছিলাম। রায় বাহাদুর রেবতীমোহন দাশ এম, এ, অবসরপ্রাপ্ত জজ প্রাণকুমার বসু, ডক্টর সুরেশচন্দ্র দেব, বাবু অশ্বিনীকুমার বাগচি, অধ্যাপক নৃপেশচন্দ্র গুহ, বাবু জ্ঞানচন্দ্র ব্রহ্মচারী, বাবু নবতরু হালদার, বাবু নিবারণচন্দ্র ঘোষ, বাবু মণীন্দ্রকিশোর চক্রবর্ত্তী প্রভৃতি যে সকল সরল ধর্ম্মপ্রাণ ব্যক্তি প্রত্যহ (কেহ কেহ দিনে দুইবার) মাকে দেখিতে আসিতেন তাঁহারা তাঁহার অভাব তীব্রভাবেই অনুভব করিয়াছিলেন।

মায়ের কৃপার ন্যায় সৌজন্যও অসীম। বরকান্তায় পৌঁছিয়া আমার, আমার স্ত্রীর এবং আমার পুত্রদের প্রত্যেকের কাছে মা স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র পত্র দেন। পূর্ব্বোক্ত ভক্তগণের মধ্যেও কাহারও কাহারও নিকট তিনি পত্র দিয়াছিলেন। মায়ের বিরহে সুকুমার বাবু অত্যন্ত ক্ষুণ্নমনে কাল-যাপন করিতেছিলেন এবং মাকে ছাড়িয়া দিবার জন্য আমাকে পুনঃ পুনঃ পত্র লিখিতেছিলেন। মাকে পাইয়া তিনি যেন পুনর্জীবন প্রাপ্ত হন। তিনিও আমাকে একখানি অতিশয় সৌজন্যপূর্ণ পত্র লিখিয়াছিলেন। বস্তুতঃ মা যেমন নিজেই কৃপা করিয়া আমার গৃহে আসিয়াছিলেন, তেমনি নিজ গুণেই তিনি নিজেকে আমাদের অত্যন্ত আপনজন করিয়া ফেলিয়াছিলেন।

বার

মায়ের কাশী যাওয়ার পূর্ব্বে আমার গৃহে তত্ত্বজিজ্ঞাসু ব্যক্তিগণ তাঁহার সঙ্গে যে সকল আলাপ-আলোচনা করিয়াছিলেন তাহার যৎসামান্য বিবরণ স্থকুমারবাবু একখানি খাতায় লিখিয়া রাখিয়াছেন। নিম্নলিখিত প্রশ্নোত্তরগুলি তাহা হইতে নকল করিয়া তিনি আমাকে পাঠাইয়াছেন। ৫ই জানুয়ারী (১৯৩৯) তারিখে সকালের দিকে প্রশ্নকর্ত্তা আশুতোষ কলেজের অস্থায়ী অধ্যাপক শ্রীযুক্ত মণীন্দ্রকিশোর চক্রবর্ত্তী অপেক্ষাকৃত নির্জ্জনে মায়ের সঙ্গে আলাপের স্থযোগে এই প্রশ্নগুলি মাকে করেন। ঐ সময়ে স্থকুমারবাবু উপস্থিত ছিলেন।

প্রশ্ন। আপনি কি ভগবান্‌কে দেখেছেন?

উঃ নিশ্চয় দেখেছি।

প্রঃ ভগবানের সহিত আপনার কি সম্বন্ধ?

উঃ অভেদ সম্বন্ধ।

প্রঃ জগতের সহিত আপনার কি সম্বন্ধ?

উঃ ভগবানের সহিত জগতের যে সম্বন্ধ আমার সহিতও জগতের সেই সম্বন্ধ।

ঐ দিনই বিকালের দিকে মণীন্দ্রবাবু মাকে আরও কয়েকটি প্রশ্ন করেন। ঐ সময়ে স্থকুমারবাবু ছাড়া ডক্টর মহেন্দ্রনাথ

সরকারও উপস্থিত ছিলেন।

প্রঃ। Evolution theory আপনি মানেন কি ?

উঃ। আপনি বিজ্ঞানসম্মত ক্রমবিকাশবাদ-সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করিতেছেন ? সেটা সত্য নহে। আমাদের শাস্ত্রমতে পরব্রহ্ম হইতে সৃষ্টির বিকাশ হয়। যেমন পরব্রহ্ম হইতে কার্য্যব্রহ্ম, কার্য্যব্রহ্ম হইতে গোলোক এই ভাবে পরপর সৃষ্টির বিকাশ হইয়াছে। ইহা একসঙ্গেই হইয়াছিল।

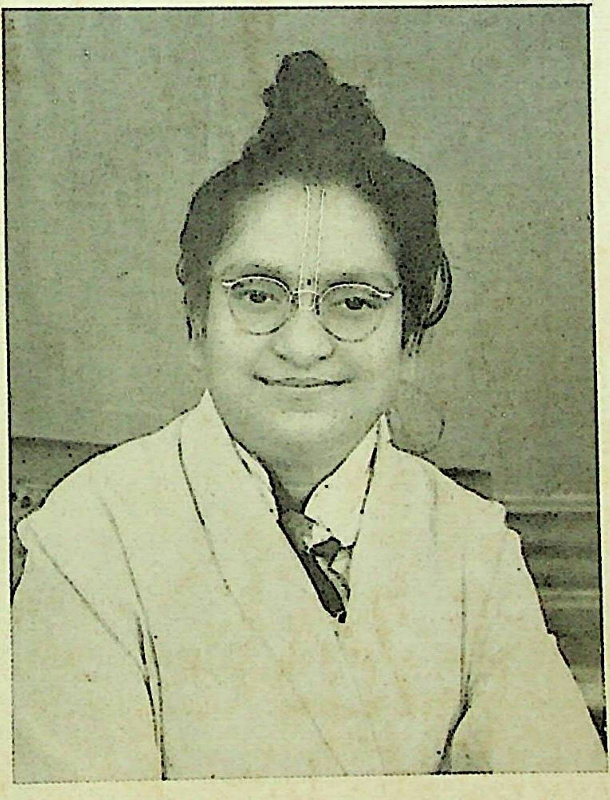
প্রঃ। ভগবান এই সৃষ্টি করিলেন কেন ?

উঃ। ভগবান্ সৃষ্টি করেন নাই। তিনি নিজেই সৃষ্ট হইয়াছেন, (অর্থাৎ) বহু হইয়াছেন।

প্রঃ। কেন ?

উঃ। ইহা তাঁহার খেলা। যেমন একটি শিশুর খেলার জন্য নানা জিনিষের প্রয়োজন হয়, সেইরূপ ভগবানেরও খেলার জন্য এই সবের প্রয়োজন।

কাশী হইতে প্রত্যাবর্ত্তনের পর সুকুমারবাবু বরকান্তা চলিয়া গেলে দর্শকগণের সহিত মায়ের আলাপাদির কোনও বিবরণ লিপিবদ্ধ করিয়া রাখিবার কোনও চেষ্টা আমার জ্ঞানমতে হয় নাই। আমি তখনও সরকারী চাকরী হইতে অবসরগ্রহণ করি নাই, তদ্ভিন্ন ভোগ-রাগাদির ব্যবস্থার জন্যও আমাকে ব্যস্ত থাকিতে হইত। কাজেই লোকের সঙ্গে তাঁহার আলাপালোচনাদির সময় আমি তাঁহার নিকট বেশীক্ষণ বসিতে



আমাদের মা

পারিতাম না। তথাপি মধ্যে মধ্যে অন্যের সহিত আলাপের সময় শোভা মা-কর্ত্তৃক ব্যাখ্যাত যে দু'একটি তত্ত্ব আমার শ্রুতিগোচর হইয়াছে এবং যাহা নিয়া তাঁহার সহিত অনেককে তর্ক করিতে শুনিয়াছি, স্মৃতি হইতে সেইরূপ কয়েকটি তত্ত্ব নিম্নে লিখিতেছি। আমি স্বয়ং একান্তে তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিয়া যে কয়েকটি কথা শুনিয়াছিলাম তাহা তৎক্ষণাৎ এক-খানি খাতায় লিখিয়া রাখিয়াছিলাম। তাহার কোনও কোনও অংশ পরের পরিচ্ছেদে উদ্ধৃত হইবে।

১। পূর্ণব্রহ্ম এই অনন্ত বিশ্বের প্রত্যেক জীবে, এবং প্রত্যেক পদার্থে এমন কি প্রতি অণুপরমাণুতে আছেন, এবং তাহা ছাড়িয়া তাহার বাহিরেও আছেন। জগতের ভাল মন্দ সব তাতেই তিনি আছেন এবং ভাল মন্দ সবই তাঁহাতে আছে। তিনি ছাড়া কিছু নাই, কিছু ছাড়াও তিনি নন, অথচ উহাতেই তিনি পর্য্যবসিত বা পরিসমাপ্ত নন।

২। পূর্ণব্রহ্ম সগুণও বটেন, নির্গুণও বটেন; তিনি যুগপৎ উভয়ই। তিনিই প্রকৃতি, তিনিই পুরুষ, তিনিই অন্ত-র্য্যামী ও ঈশ্বর এবং তিনিই অক্ষর ব্রহ্ম।

(দার্শনিক পরিভাষায় বলিতে গেলে বোধ করি এই কথাটি এই ভাবে বলা যায় যে, পূর্ণব্রহ্ম গুণাত্মক, গুণভোক্তা, গুণনিয়ামক এবং গুণবিরহিত সবই; উপাধিভেদে নাম ও ক্রিয়ার ভেদ হয়।)

৩। এই বিশ্ব জগতের সৃষ্টি এক মুহূর্ত্তেই হইয়াছে; আর নূতন করিয়া কিছুই সৃষ্ট হইতেছে না। পূর্ব্বে সৃষ্ট বস্তুরই কালে প্রকাশ হইতেছে মাত্র। যাহা ভবিষ্যতে হইবে বলিয়া আমরা মনে করি, প্রকৃত পক্ষে সে সবই আগেই হইয়া আছে। যেমন ছায়াচিত্রের চিত্রগুলি আগেই প্রস্তুত থাকে, তারপর প্রদর্শনের সময় একটির পর একটি প্রকাশ পায়, এও কতকটা সেইরূপ।

৪। মানুষের ভূত, ভবিষ্যৎ, বর্ত্তমান—সবই পূর্ব্ব হইতে নির্দ্দিষ্ট আছে। মানুষের চেষ্টার দ্বারা বা চেষ্টার অভাব-দ্বারা পূর্ব্বনির্দ্দিষ্ট ভবিতব্যেরই বিকাশ হয়। কে গুরু পাইবে বা পাইবে না এবং পাইলে কোন জন্মে কাহাকে পাইবে তাহাও নির্দ্দিষ্ট আছে।

৫। জগতে নিত্যমুক্ত জীবও যেমন আছেন, নিত্যবদ্ধ জীবও তেমনি আছে। নিত্যবদ্ধ জীবদিগের বর্ত্তমান কল্পে কোনও জন্মেই মুক্তি নাই। অবশ্য কল্পান্তরে মুক্তি হইতে পারে। অন্যেরা এজন্মে বা পরে কোনও জন্মে মোক্ষ পাইবে। সদ্‌গুরুর কৃপা পাইলে তিনজন্মের মধ্যেই অবশ্য মোক্ষ হইবে।

৬। মোক্ষের জন্য সদ্‌গুরুর কৃপা একান্ত আবশ্যক। সদ্‌গুরুর অভাবে নিজের ঐকান্তিক চেষ্টায় বা অন্যবিধ গুরুর উপদেশে অনেক দূর অগ্রসর হওয়া অসম্ভব নহে, কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত যাওয়া সম্ভব নয়।

৭। প্রাণিহত্যা পাপ এবং তাহার ফলও অবশ্য ভোগ করিতে হয়, যেমন অন্য সকল কর্ম্মেরও ফল অবশ্যভোগ্য। ডাঁশ, মশা ইত্যাদি মারিলেও পাপ অবশ্যই হয়; তবে তাহার জন্য যে ভোগ তাহা তাদৃশ কষ্টকর হয় না। হয় ত একটু মাথা ধরাতে বা ঐরূপ সামান্য ক্লেশে ঐ শ্রেণীর কতকগুলি পাপের ভোগ নিঃশেষ হয়।

(এই প্রসঙ্গ নিয়া মায়ের সঙ্গে অনেকে অনেক কুতর্ক করিতেন। তাঁহারা বলিতেন প্রাণিহত্যা যদি পাপ হয়, তবে নরহত্যাতেও যেরূপ পাপ, মশা-মাছি মরিলেও সেই-রূপ পাপই হওয়া উচিত!)

সংসারে থাকিয়া কি করিয়া ভগবানের সেবা করা যায় এই প্রশ্নের উত্তরে মা বলেন, স্ত্রী, পুত্র, কন্যা, আত্মীয়স্বজন এবং স্বামী, শ্বশুর প্রভৃতিকে ভগবদ্‌বুদ্ধিতে সেবা করিতে হয়।

প্রশ্ন। ভগবদ্‌বুদ্ধি বলিতে কি বুঝিব?

উত্তর। প্রত্যেকের মধ্যেই ভগবান্ রহিয়াছেন এবং তিনিই স্ত্রী, পুত্র ইত্যাদি রূপে আমার সেবা গ্রহণ করিতেছেন—এইরূপ বুদ্ধি।

শেষোক্ত উপদেশটি মা অনেককেই দিয়া থাকেন। কিন্তু আমি উহা পাইয়াছি শ্রীযুক্ত সুকুমারবাবু হইতে; উহা আমার বাড়ীতে আমাকর্ত্তৃক শ্রুত নয়। নিম্নোক্ত উপদেশটিও সুকুমারবাবুই আমাকে লিখিয়া জানাইয়াছেন। দুইটি উপদেশই

খুব practical (কার্য্যোপযোগী) বলিয়া এই পরিচ্ছেদে দিলাম।

প্রশ্নকর্ত্তা কুমিল্লার কোর্ট অব ওয়ার্ডসএর জেনারাল ম্যানেজার শ্রীযুক্ত বি, এন্, ভট্টাচার্য্য। প্রশ্নঃ—সারাদিন আফিসের কাজের পর সন্ধ্যাবেলায় যখন একটু জপ করিতে বসি তখন কেবলই মনে হয়, কোন্ নায়েব কি ত্রুটি করিল, কোন্ এষ্টেটের রেভিনিউ ডিউ হইল (সদর খাজনা দিবার সময় হইল), কোন্ তহশীলদারকে কি উপদেশ দেওয়া বাকি রহিল ইত্যাদি। এই সব বাজে চিন্তা মন হইতে দূর করিবার কি উপায় আছে বল।

উত্তর। এমনই সচরাচর হইয়া থাকে। একটু শান্ত মন পাইলেই সংসারের সব চিন্তা আসিয়া চাপিয়া বসিতে চায়। তখন ভগবানের নিকট প্রার্থনা করিতে হয়, হে ভগবান, তুমি আমার কাছে ঐ সব চিন্তারূপে না আসিয়া আমার ইষ্টরূপে দেখা দেও।

অসম্বদ্ধ বিবিধ প্রশ্নের উত্তরে কাহারও বিশেষ উপকার বা জ্ঞান হয় না বলিয়া মহামহোপাধ্যায় গোপীনাথ কবিরাজ এইরূপ পরিকল্পনা করিয়াছিলেন যে, এক একটি প্রসঙ্গে যতপ্রকার প্রশ্ন হইতে পারে তাহা পূর্ব্বে লিখিয়া লইয়া তিনি স্বয়ং বা অন্য কাহারও দ্বারা ক্রমবদ্ধভাবে মাকে সেইগুলি জিজ্ঞাসা করিবেন এবং মায়ের সঙ্গেও এইরূপ স্থির করা হইয়াছিল যে, তিনি এমন ভাবে উত্তর দিবেন যেন তাহা তখনই লিখিয়া লওয়া যাইতে

পারে। এই পরিকল্পনা-অনুসারে কাশীতে মাত্র দুইদিন (ইং ১৯৩৯ সনের ৭ই ও ৮ই জানুয়ারী) কার্য্য হইয়াছিল। প্রশ্নোত্তরগুলি মূল্যবান্ বলিয়া সমগ্রভাবে এখানে দেওয়া যাইতেছে ঃ—

প্রথম দিন

প্রশ্ন। দীক্ষা কত প্রকার?

উত্তর। দীক্ষা তত্ত্বতঃ একই প্রকার। শিষ্যের অধিকার-অনুসারে মন্ত্রের তারতম্য হয়।

প্রঃ। শাস্ত্রে নানাপ্রকার দীক্ষার কথা আছে, সেই সকল বিভিন্ন দীক্ষাপ্রণালীর মূল তত্ত্বটি কি?

উঃ। যে মন্ত্রদ্বারা গুরু শিষ্যের কুণ্ডলিনী শক্তি জাগরিত করেন সেই মন্ত্রদানরূপ কার্য্যকেই দীক্ষা বলে।

প্রঃ। সাধনার ক্রমবিকাশে এক দেবতা হইতে অন্য দেবতার উপলব্ধি সম্ভবপর কিনা? যদি সম্ভবপর হয় তাহা হইলে সাধকের ঐ উর্দ্ধগতি স্বভাবতঃই নিষ্পন্ন হয় অথবা তজ্জন্য পুনর্ব্বার দীক্ষার আবশ্যকতা হয়?

উঃ। সদ্‌গুরু-প্রদত্ত মন্ত্রে উহা সম্ভবপর। সদ্‌গুরু প্রথমে অল্পশক্তি-সম্পন্ন মন্ত্র দিলেও সাধক সেই মন্ত্রে সম্পূর্ণ সিদ্ধ হইলে পরবর্ত্তী উচ্চশক্তিসম্পন্ন মন্ত্র আপনা হইতেই ভিতরে জাগরিত হইয়া থাকে। কেন না পূর্ণ গুরুশক্তি পিছনে থাকিয়া কার্য্য করিতেছে। জীবনী শক্তির প্রভাবেই যেমন বাল্য, কৈশোর,

বার্দ্ধক্য আপনা হইতেই প্রকাশিত হয়, তদ্রূপ গুরুশক্তি পিছনে থাকিলে চরম অবস্থায় ব্রহ্মজ্ঞান স্বভাবতঃই হইয়া থাকে।

প্রঃ। মন্ত্রবিশেষের সাধক দেহান্তে মন্ত্র-প্রতিপাদ্য দেবতার লোকে গমন করিয়া কি ক্রমানুসারে সালোক্য হইতে সেই দেবতার সহিত সাযুজ্য বা ঐক্য লাভ করিয়া থাকে ?

উঃ। প্রথমে সাধক সালোক্য, তৎপর সারূপ্য, ও তৎপর সাযুজ্য লাভ করিবে। যদি সাধক সদ্‌গুরু-প্রদত্ত মন্ত্র না পাইয়া ঐ লোকে যায় তাহা হইলে লোকাধিপতির সমান হইতে পারে না অর্থাৎ সাযুজ্য লাভ হইবে না। যে সাধক সদ্‌গুরু-প্রদত্ত মন্ত্রের প্রভাবে সাযুজ্য পর্য্যন্ত লাভ করিবে সে তৎপরেই আপনা হইতে পরবর্ত্তী উর্দ্ধতর লোকে চলিয়া যাইবে।

প্রঃ। সাযুজ্যলাভ করিলে সাধকের পৃথক্ সত্তা থাকে কি না ? থাকিলে ঐ অবস্থাকে সাযুজ্য বলা উচিত কি না ? না থাকিলে ঐপ্রকার সাযুজ্যপ্রাপ্ত ব্যক্তির উর্দ্ধগতির সম্ভাবনা কোথায় ?

উঃ। যদি সদ্‌গুরু-প্রদত্ত মন্ত্রের বলে সাধক উক্ত দেবতার লোকে প্রবেশ করে এবং ক্রমশঃ অগ্রসর হইতে থাকে তাহা হইলে চরম অবস্থায় উক্ত দেবতার সঙ্গে ঐক্য লাভ করিয়া তাঁহাকে অতিক্রম করিয়া চলিয়া যায়। কিন্তু যদি সদ্‌গুরুপ্রদত্ত মন্ত্রের সহায়তা না থাকে, তাহা হইলে উক্তপ্রকার সাযুজ্য হইতেই পারে না। কারণ সাধক যত উচ্চ অবস্থাই লাভ করুন না কেন, তাঁহাকে ইষ্ট-দেবতা হইতে ন্যূনশক্তিবিশিষ্ট থাকিতেই

হইবে। সুতরাং সাযুজ্যাবস্থায় স্থিতি কোনও দেবতাতেই হইতে পারে না। একমাত্র পূর্ণব্রহ্মেই তাহা সম্ভব।

প্রঃ। বীজ, মন্ত্র ও নামের পরস্পর ভেদ কি ?

উঃ। নামে আর বীজে ভেদ নাই, কিন্তু শক্তির পার্থক্য আছে।

প্রঃ। শুধু নামকে আশ্রয় করিয়া দীক্ষা দেওয়া চলে কি না ?

উঃ। শুধু নামে সদ্‌গুরু দীক্ষা দেন না।

প্রঃ। সদ্‌গুরু কাহাকে বলে ?

উঃ। যিনি অন্ততঃ ধ্যানের দ্বারা কার্য্যব্রহ্মকে জানিতে পারেন তিনিই সদ্‌গুরু।

প্রঃ। সদ্‌গুরু না হইয়া মন্ত্রপ্রদান করিলে তাহা কতদূর ফলপ্রসূ হইবে।

উঃ। তৃতীয়ভূমি পর্য্যন্ত।

প্রঃ। সদ্‌গুরুর শক্তিব্যতিরেকে শুধু মন্ত্রশক্তি সাধকের সাধনপ্রভাবে কার্য্যকরী হইতে পারে কি না ?

উঃ। কতকটা হইতে পারে, তবে পূর্ণতালাভ হইবে না।

প্রঃ। সদ্‌গুরুর কৃপা একমাত্র দীক্ষা-ব্যাপারেই পরিসমাপ্ত হইয়া যায় অথবা তাহার পরও অধিকার-অনুসারে ক্রমশঃ প্রকাশিত হয় ?

উঃ। দীক্ষার সঙ্গে সঙ্গেই সদ্‌গুরু পূর্ণ কৃপাই করিয়া থাকেন। শিষ্য আপন অধিকার-অনুসারে শীঘ্র বা বিলম্বে তাহা অনুভব করেন।

প্রঃ শিষ্যের কর্ম্মক্ষয় কোন্ কোন্ উপায়ে হইয়া থাকে ?

উঃ। গুরুকৃপা হইতেই সাধনা অথবা ফলভোগকে আশ্রয় করিয়া শিষ্যের কর্ম্মক্ষয় হয়। গুরুকৃপা হইতে শিষ্যের প্রারব্ধ ব্যতীত অন্য কর্ম্মের ক্ষয় হয়। এবং কর্ম্মক্ষয়ের ফলে জ্ঞানের বিকাশ হয়। জ্ঞানলাভ হইলেই সত্যবস্তুর প্রকাশ হয়। প্রারব্ধ কর্ম্মের ক্ষয় হইলে দেহ থাকে না। "প্রারব্ধ" অর্থ—কারণদেহের সংস্কার। এই সংস্কার নষ্ট হইলে দেহ থাকিতে পারে না। কিন্তু এই সংস্কার থাকিলেও সত্যদর্শনে কোনও ব্যাঘাত হয় না। তখন ঐ মুক্তপুরুষ কর্ম্মের অধীন থাকেন না, বরং কর্ম্মই তাঁহার অধীন হইয়া যায়।

প্রঃ। সদ্‌গুরুর শক্তি কতটা সময়ে শিষ্যের সমস্ত কর্ম্ম ক্ষয় করিয়া তাহাকে পরমপদে প্রতিষ্ঠিত করিতে পারে ?

উঃ। তিন জন্মের মধ্যে (নিম্নতম অধিকারীর পক্ষে)।

দ্বিতীয় দিন

প্রঃ। সদ্‌গুরু চিনিবার উপায় কি ?

উঃ। কোনও উপায় নাই। শ্রীভগবানের উপর নির্ভর করিয়া পড়িয়া থাকিতে হয়। সদ্‌গুরুপ্রাপ্তি সুকৃতির উপর নির্ভর করে।

প্রঃ। সদ্‌গুরু হইতে দীক্ষা নেওয়ার পর এমন হইতে পারে কি যে, দীর্ঘকাল কোনওরূপ অনুভব হইল না ? যদি তাহা হয়, তবে তাহার কারণ কি ? এমত অবস্থায় যদি সে অন্য গুরু গ্রহণ

করে, তবে গুরুত্যাগজনিত দোষ হয় কি না ?

উঃ। হ্যাঁ পারে। ক্ষেত্র তৈরী না থাকিলে বীজ অঙ্কুরিত হইতে যেরূপ দেরী হয় ইহাও তদ্রূপই।

না ; সদ্‌গুরু লাভ হইলে তাহার ত্যাগ কখনই হয় না।

প্রঃ। কোনও কোনও গুরু দীক্ষা দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে শিষ্যের নানারূপ দর্শন ও অনুভূতি হইতে থাকে। অথচ অনেক সময় দেখা যায় যাঁহাদিগকে আমরা খুব উচ্চ মনে করি, তাঁহাদের শিষ্যদের বিশেষ কোনও দর্শন বা অনুভূতি হয় না। ইহার কারণ কি ?

উঃ। সদ্‌গুরু শিষ্যের যোগ্যতা ও অধিকার বিচার করিয়াই অনুরূপশক্তিসম্পন্ন বীজ বা দীক্ষা দান করিয়া থাকেন। কিন্তু যাঁহারা সদ্‌গুরু নহেন, তাঁহারা শিষ্যের সামর্থ্যের অনুরূপ বীজদান করিতে না পারায় শিষ্যের চিত্তে ও দেহে নানারূপ বিকার উপস্থিত হয়। যে সকল দর্শন বা অনুভূতির কথা বলা হইতেছে তাহা ঐ সকল বিকার ভিন্ন অন্য কিছুই নহে ; তাহা স্থায়ী হইতে পারে না, এবং তজ্জনিত আনন্দও স্থায়ী হয় না।

প্রঃ। সদ্‌গুরুর নিকট দীক্ষা না পাইয়াও নানারূপ দর্শন ও অনুভূতি হইতে পারে কি ?

উঃ। হাঁ, পারে।

প্রঃ। যদি হয় তবে তদ্দ্বারা যথার্থ আধ্যাত্মিক উন্নতি হয় কি ?

উঃ। না।

প্রঃ। ঐ সকল দর্শনাদি চলার পথে সহায়ক কি না ?

উঃ। না।

প্রঃ। সদ্‌গুরু হইতে দীক্ষা প্রাপ্ত হইলেও যদি দীর্ঘকাল কোনওরূপ দর্শন বা অনুভূতি লাভ না হয়, তাহা হইলে সেই অবস্থাকে উন্নতি কিম্বা অবনতি বলিব ?

উঃ। তাহা স্থিতিও হইতে পারে, আবার অবস্থাবিশেষে তাহা উন্নতিও বলা যাইতে পারে, তাহা সাধকের অবস্থা-অনুযায়ী। সদ্‌গুরুর কৃপা প্রাপ্ত হইলে সাধকের জীবনে অবনতি কখনই হইতে পারে না।

প্রঃ। দীক্ষালাভের পর কোনও কোনও স্থলে দেখা যায় যে, এমন কতকগুলি বৃত্তি প্রবল হইয়া উঠে যাহা পূর্ব্বে ছিল না ; ইহার কারণ কি ? স্থূল দৃষ্টিতে ইহা অধঃপতন বলিয়াই মনে হয়।

উঃ। ভোগ হইয়া যায়। ইহা অধঃপতন হইতে পারে না।

প্রঃ। বিশ্বাসের মূল কি ? কখন কি উপায়ে বিশ্বাস স্থায়ী হয়।

উঃ। গুরুকৃপা। ভগবৎকৃপাতেই হয়।

উক্ত প্রশ্নোত্তরগুলির সঙ্গে কাশীতে অন্য একজন জিজ্ঞাসুর (শ্রীযুক্ত হরিচরণ ঘোষ মহাশয়ের) কয়েকটি প্রশ্নের নিম্নোক্ত উত্তরগুলি আমার হস্তগত হইয়াছে। ৭ই জানুয়ারী (১৯৩৯) তারিখে এই উত্তরগুলি প্রদত্ত হয়।

গুরু মন্ত্র দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে কুণ্ডলিনী শক্তি জাগরিত

হইবে। সাধক তাহা বুঝিতে না-ও পারে।

সদ্‌গুরু সকলেই (মূলে) এক। একজন সদ্‌গুরু অন্য সদ্‌গুরুর দেহান্তে তাঁহার শিষ্যদিগের ভোগ স্থূল দেহে ভুগিয়া থাকেন। এখানে কোনও সাম্প্রদায়িকতা নাই।

গায়ত্রীমন্ত্রে দীক্ষার পরও অন্য মন্ত্রে দীক্ষার প্রয়োজন আছে। গায়ত্রীমন্ত্র দেবীলোক পর্য্যন্ত নিয়া যাইতে পারে; তার ঊর্দ্ধে পারে না।

প্রণব ছাড়া মন্ত্র সম্পূর্ণ হয় না। প্রণবের মধ্যে সমস্তই রহিয়াছে। অতএব প্রণবযুক্ত মন্ত্রে পৃথক্ বীজ না-ও থাকিতে পারে।

———

ভের

সাধকগণের ভূমি-সম্বন্ধে অনেক কথা পূর্ব্বে শিশিরবাবুর ডায়েরী হইতে উদ্ধৃত হইয়াছে। মহামোহপাধ্যায় গোপীনাথ কবিরাজের শোভা মায়ের সহিত সাক্ষাতের পরে তাঁহার নিকটেও ভূমিসম্বন্ধে মায়ের মত কিছু কিছু অবগত হইয়াছিলাম। তাহাতেও বিষয়টি সম্বন্ধে স্পষ্ট ধারণা হয় নাই। সেইজন্য একদিন শোভা মাকে একটু একান্তে পাইয়া ঐ বিষয়ে আমি প্রশ্ন করি। তদুত্তরে তিনি যাহা বলেন তাহা এইরূপ :—

ভূমিগুলিতে সকলের অবস্থা সমান হয় না ইহা মনে রাখিতে হইবে। প্রথমতঃ যাঁহাদের গুরু অর্থাৎ সদ্‌গুরু আছেন তাঁহাদের অবস্থা বর্ণিত হইতেছে।

প্রথমভূমিতে সাধকের গুরুর প্রতি বিশ্বাস দৃঢ় হয়। সমাধি সকলের হয় না।

ভক্তিমার্গে গেলে দ্বিতীয়ভূমিতে সমাধি হয় ; কিন্তু তাহা জড়-সমাধি ; ইহাতে আনন্দবোধ থাকে না, একটা শুষ্ক কঠিন ভাব থাকে মাত্র। এই ভূমিতে গুরুর স্বরূপ অনুভব করা যায়। তখন এই বোধ জন্মে যে, গুরুই সব। জ্ঞানমার্গে যাঁহারা যান এই ভূমিতে তাঁহাদের বিচারই চলিতে থাকে, তবে তাঁহারাও গুরুর কৃপা উপলব্ধি করিতে পারেন।

ভক্তিমার্গে সাধক তৃতীয়ভূমিতে ইষ্টদেবতাকে বুঝিতে পারেন

এবং মন্ত্র ও দেবতার ঐক্য উপলব্ধি করেন। কিন্তু ইষ্টদেবতার ও গুরুর ঐক্যের উপলব্ধি তখনও হয় না। জ্ঞানমার্গীদের এই ভূমিতেও বিচারই চলে এবং তৎসঙ্গে তাঁহাদের কিছু কিছু আনন্দের উপলব্ধি হয়।

চতুর্থভূমিতে ভক্তিমার্গীদের নির্ব্বিকল্প সমাধি হয়। তখন সমস্তই শুধু আনন্দময় বোধ হয়। ইষ্টদেবতা, গুরু, ও আমি— ইহাদের মধ্যে পৃথক বোধ থাকে না, সব মিলিয়া এক হইয়া যায়। ইহাই অদ্বৈত অবস্থা, ইহার মধ্যে কিছুমাত্র দ্বৈতবোধ থাকে না। সদ্‌গুরুর কৃপা ছাড়া এই অবস্থা প্রাপ্ত হওয়া যায় না। জ্ঞান-মার্গীদেরও এই ভূমিতে নির্ব্বিকল্প সমাধি হয়। তাঁহাদের সাধারণতঃ সবিকল্প সমাধি হয় না। অবশ্য মনে রাখিতে হইবে শুদ্ধ জ্ঞানমার্গী সাধক খুব বিরল।

পঞ্চমভূমির প্রথমভাগে সাধক সব-কিছুর মধ্যেই নিজকে এবং ইষ্টদেবতাকে দেখেন এবং নিজের মধ্যেও সব-কিছুকে দেখেন। এই ভূমিতে আবার দ্বৈত আসিয়া পড়ে, এবং ইষ্ট-দেবতাকে তাঁহার পূর্ব্বমূর্ত্তিতে অর্থাৎ ইষ্ট মূর্ত্তিতে দেখা যায়। কিন্তু ইষ্টদেবতা ও আমি ইহার মধ্যে দ্বৈতবোধ থাকে না। এই ভূমির মাঝামাঝি পূর্ণ ব্রহ্মজ্ঞান আসে। তখন তাহাতে সব-কিছু আছে এবং সর্বকিছুর মধ্যে তিনি আছেন এ বোধও থাকে এবং তদতিরিক্ত ভাবেও তিনি আছেন সে বোধও যুগপৎ হয়। ভক্তিমার্গের ইহাই শেষ ভূমি বলা যাইতে পারে। ইহার পর ব্রহ্মরূপতা হইয়া যায়। জ্ঞানমার্গীরা পঞ্চমভূমিতে সর্ব্বভূতে ব্রহ্মদর্শন

করেন। ব্রহ্ম যে সর্ব্বভূতে আছেন এবং তদতিরিক্ত ভাবেও আছেন এ বোধ তাঁহাদের ষষ্ঠভূমিতে হয়। ষষ্ঠভূমিতে তাঁহারা পূর্ণব্রহ্মজ্ঞ হন। সপ্তমভূমিতে তাঁহাদের ব্রহ্মরূপতা হয়।*

সাধন চতুর্থভূমি পর্য্যন্ত থাকে। নির্বিকল্প সমাধির পর আর সাধন থাকে না। জ্ঞানমার্গী বা ভক্তিমার্গী সকলেরই জগৎ ধ্যানগম্য হয়। পঞ্চমভূমির মাঝামাঝি ব্রহ্মজ্ঞতা আসিলে সামান্য ও বিশেষ সমস্ত জ্ঞানই হয়।

যাঁহাদের গুরু অর্থাৎ সদ্‌গুরু হয় নাই (সদ্‌গুরু ভিন্ন গুরু পাওয়া না পাওয়ার একই ফল) তাঁহাদের বিষয়ের প্রতি তীব্র বৈরাগ্য ও ভগবানের প্রতি কিছু আকর্ষণ হইলেই প্রথমভূমি-লাভ হয়। দ্বিতীয়ভূমিতে তাঁহাদের ভগবানের প্রতি অনুরাগ খুব প্রবল হয়। তৃতীয়ভূমিতে তাঁহারা মূর্ত্তিবিশেষে ভগবান্‌কে প্রত্যক্ষ করেন। কেহ কেহ প্রথম-ভূমিতেও ভগবদ্দর্শন-লাভ করিতে পারেন। তবে সেই দর্শন ছায়াদর্শন।

---

* শ্রীযুক্ত গোপীনাথের প্রশ্নের উত্তরে এক চিঠিতে শোভা মা ব্রহ্মরূপতা সম্বন্ধে এইরূপ লিখিয়াছিলেন,—"স্থূল, সূক্ষ্ম, কারণ তত্ত্বগুলি সবই যখন ব্রহ্মাকার হইয়া যায়, তখনই ইহাকে ব্রহ্মরূপত্ব বলা হয়।" পুনশ্চ "ব্রহ্মজ্ঞান হইলে জীবের স্থূলের সম্পূর্ণ এবং সূক্ষ্মের কিছু তত্ত্বগুলি ব্রহ্মাকার হইয়া যায়, কিন্তু সূক্ষ্মের কিছু এবং কারণ দেহের সম্পূর্ণ তখনও ব্রহ্মাকার হয় না। কাজেই ষষ্ঠভূমিতে ব্রহ্মরূপতালাভ করিলে স্থূল সূক্ষ্ম কারণ তত্ত্বগুলি সব ব্রহ্মাকার হইয়া যায়।"

লোক অর্থাৎ ভুবন সম্বন্ধে শোভা মা আমাকে এইরূপ উপদেশ করেন :—

ভূঃ, ভুবঃ, স্বঃ. মহঃ, জন, তপঃ, সত্য এই সপ্ত লোকের পর ক্রমশঃ উর্দ্ধ উর্দ্ধতর হিসাবে নিম্নলিখিত লোকগুলি আছে :—

১। দেবীলোক (অধিষ্ঠাত্রী কালী)

২। নিম্নস্থ ব্রহ্মলোক।

৩। উর্দ্ধস্থ ব্রহ্মলোক (অধিষ্ঠাতা ব্রহ্মা)

(এই দুইটি লোকে গুণে ও আনন্দে প্রভেদ আছে।)

৪। কৈলাস, বৈকুণ্ঠ, গোলোক।

শিবদুর্গা কৈলাসের, (চতুর্ভুজ) বিষ্ণু ও লক্ষ্মী বৈকুণ্ঠের, এবং (দ্বিভুজ) কৃষ্ণ ও রাধা গোলোকের অধিপতি। এই তিনটি লোক প্রায় সমস্তরেরই বলা যায়।

৫। কার্য্যব্রহ্ম

৬। পরব্রহ্ম

সদগুরুর আশ্রয় পাইলে সাধক যদি সাধারণ অধিকারী হন, তবে তাঁহার যোগ্যতা ও প্রাক্তনকর্ম্মানুসারে দেহান্তে তাঁহার গতি স্বর্লোক হইতে তপোলোক পর্য্যন্ত হইতে পারে। যদি প্রথমভূমির আদ্যাবস্থার হন, তবে গতি অন্ততঃ সত্যলোক এবং অন্তিমাবস্থার হইলে দেবীলোক। দ্বিতীয়ভূমির আদ্যাবস্থার গতি অন্ততঃ দেবীলোক, অন্তিম অবস্থার গতি নিম্নস্থ ব্রহ্মলোক। তৃতীয়ভূমির আদ্যাবস্থায় অন্ততঃ নিম্নস্থ ব্রহ্মলোক-

প্রাপ্তি, অন্তিম অবস্থায় ও চতুর্থভূমির আদ্যাবস্থায় উর্দ্ধস্থ ব্রহ্মলোক প্রাপ্তি ঘটে। চতুর্থভূমির শেষ এবং পঞ্চমভূমির প্রথম অবস্থায় গতি ও স্থিতি বৈকুণ্ঠে বা কৈলাসে। পরে সাধক গোলোকে কিছুকাল স্থিতি করিয়া চরমে কার্য্যব্রহ্মঃ হইয়া পূর্ণব্রহ্মে প্রবিষ্ট হইবেন। পঞ্চমের মধ্য বা অন্তিম অবস্থায় দেহান্ত হইলে কৈলাসের বা গোলোকের মধ্য দিয়া কার্য্যব্রহ্ম পরে পরব্রহ্মে গতি হইবে। এখানে কার্য্যব্রহ্মে একটু স্থিতি হয়। ষষ্ঠভূমিতে অর্থাৎ ব্রহ্মরূপতা সিদ্ধ হইলে দেহান্তে কার্য্যব্রহ্মে স্থিতি হয় না, একেবারে পরব্রহ্মে প্রবেশ হয়।

উপরের অনুচ্ছেদে লিখিত উক্তিগুলি সমস্তই সগুণ-সাধক-দিগের অর্থাৎ ভক্তগণের সম্বন্ধে প্রযোজ্য বুঝিতে হইবে। নির্গুণ সাধকদিগের সম্বন্ধে আমি কোন প্রশ্ন করি নাই। তাঁহাদের গতি সম্পর্কে শোভা মা শ্রীযুক্ত গোপীনাথকে এক পত্রে এই প্রকার লিখিয়াছিলেন, "নির্গুণসাধক নির্ব্বিকল্প সমাধির পূর্ব্বে দেহত্যাগ করিলে অধঃস্থিত ব্রহ্মলোকে যাইবেন এবং নির্ব্বিকল্প সমাধি লাভ করিয়া যদি দেহত্যাগ করেন তবে উর্দ্ধস্থিত ব্রহ্মলোকে যাইবেন। সমাধির পর কৈবল্যপ্রাপ্ত হইয়া মৃত্যু হইলে কার্য্যব্রহ্মে গতি হইবে।"

নাম দেওয়া ও দীক্ষা দেওয়া সম্বন্ধে আলোচনা প্রসঙ্গেও শোভা মা আমাকে অনেক কথা বলিয়াছেন। উভয়ের ফলে প্রভেদের কথা এবং মালাতিলক-ধারণ সম্বন্ধে কয়েকটি কথা পূর্ব্বে

(২৭ পৃঃ) প্রসঙ্গক্রমে উল্লিখিত হইয়াছে। এখানে আরও কয়েকটি উপদেশ প্রদত্ত হইল।

তিলকধারণে মন সাত্ত্বিকভাবাপন্ন হয়। ভগবানের অঙ্গে তিলক আছে বলিয়া তিলকধারণ করিতে হয়। উহা এক প্রকারেরই। সম্প্রদায়ভেদে নানারূপ তিলক কল্পিত হইয়াছে। তিলক দ্বাদশ অঙ্গে ধারণ করিতে হয়।

দীক্ষা নিলে নাম আসনে বসিয়া জপ করিতে হয়। নাম নিলেও আসনে বসিয়াই নাম করা ভাল। কম্বলাসন প্রশস্ত। আসনে বসিলে শরীর হইতে তড়িতের অপচয় হয় না।

নাম নিলে বা দীক্ষা নিলে গুরুর পটপূজা, ভোগ, আরতি ইত্যাদি করা ভাল, তবে অবশ্যকর্ত্তব্য নয়। ঐ সকল আনুষঙ্গিক কার্য্য দ্বারা মন ঐ দিকে যায়। ঐ সব সেবা অধিক করিয়া জপ ইত্যাদি কম করিলেও কাজ হইবে।

গুরু দেহে থাকিতে (সামাজিক শৃঙ্খলা ইত্যাদির প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া) শিষ্যের পক্ক অন্ন গ্রহণ না করিলেও তাঁহার দেহান্তে তাঁহার পটের কাছে পক্ক অন্ন ভোগ দেওয়া যায়। নিজের জাতিই ভগবানের জাতি।

স্ফটিক, পদ্মবীজ বা রুদ্রাক্ষ হইতে তুলসীর মালায় সত্ত্বগুণ অধিক।

জপ দু'বেলাই করিতে হইবে। তবে যত করা যায় ও যত বার করা যায় ততই ভাল। জপের সময় পদ্মাসন ইত্যাদিরূপ আসন করিয়া বসিলে ফল ভাল হয়। গুরুদেব যাহাকে যে

আসন করিয়া বসিতে বলেন তাহার পক্ষে সেইরূপ আসন করিয়া বসাই মঙ্গল।

জপের সময় মন্ত্রের ধ্যান কর্ত্তব্য। জপের পূর্বে প্রথমে ইষ্টদেবতার ধ্যান ও পরে গুরুর ধ্যান করিয়া জপ করিতে হয়। জপান্তেও ঐরূপ ধ্যান কর্ত্তব্য। মন্ত্রের ধ্যানের অর্থ মন্ত্রের ধ্বনি সুস্পষ্টভাবে শ্রবণ করা।

মানস জপই প্রশস্ত। মানস জপ বা উপাংশু জপের উপদেশ অধিকারি ভেদে দেওয়া হয়। মন্ত্রের বাচিক জপ কর্ত্তব্য নয়। প্রণব সহিত নামের বাচিক জপও কর্ত্তব্য নয়। শুধু নাম উচ্চৈঃস্বরে বলা চলে।

ধ্যান মস্তকে করাই ভাল।

অতঃপর আমার নিকট লিখিত কয়েকখানি চিঠির কিছু কিছু অংশ এই স্থানে উদ্ধৃত হইতেছে :—

[১]

ভগবান্ নববর্ষের ন্যায়—আপনাদের আধ্যাত্মিক জীবনের অনুভূতিও নব করিয়া দিন, এই ইচ্ছা করি। মণিলাল (আমার এক চিররুগ্ন পুত্র এবং শোভা মায়ের পরম ভক্ত) কেমন আছে? তাহার অসুখের খবরে চিন্তিত রহিলাম। সাংসারিক এই সকল বাধা-বিপত্তিতেও ভগবৎ-চরণে মন অচল ও অটল রাখিবেন। এই সমস্ত ক্ষুদ্র হইতে ক্ষুদ্রতর বাধা-বিপত্তিতে যদি মন চঞ্চল হয় তবে এই মহান সমুদ্র কি করিয়া পার হইবেন? এ

সমস্ত কিছু না। লীলাময়ের লীলার পরীক্ষা-মাত্র। তাঁহার খেলা অক্ষুব্ধ চিত্তে দেখিয়া যান ; তবেই খেলার গূঢ় রহস্য বুঝিতে পারিবেন। ভগবান আপনাদের সর্ব্বাঙ্গীণ কল্যাণ করুন। তাঁহারই কৃপায় তাঁহাকে ধরিতে ও চিনিতে পারেন এই ইচ্ছা করি।

[২]

সংসারের কত ঝড়-ঝঞ্ঝাট আছে, তাহাদিগকে অতিক্রম করিতে হইলে একমাত্র গুরুদেব ও তদ্‌মন্ত্রই ভরসা। আপনারা গুরু পাইয়াছেন, অতএব তাঁহার প্রতি অটল ভক্তিবিশ্বাস রাখিয়া চলিতে পারিলেই এই ভবসমুদ্র পার হইতে পারিবেন। সাংসারিক সামান্য ব্যাপারে যদি অস্থির হইয়া পড়েন, তবে এই মহান্ সমুদ্ররূপ ভবসাগর কি করিয়া অতিক্রম করিবেন ? ভগবানের সমস্ত কর্ম্মই মঙ্গলজনক। আপাতদৃষ্টিতে আমরা অমঙ্গল দেখিলেও ভবিষ্যতে তাহার দ্বারা মঙ্গলই সাধিত হয়, এ বিষয়ে কোনও সন্দেহ নাই।

[৩]

আপনার পত্র কয়েক দিন হয় পাইয়াছি। সাংসারিক ঝঞ্ঝাটে আছেন দেখিলাম। এ কথা সত্য যে সর্ব্বক্ষেত্রেই যিনি বা যে বড় তাঁহাকেই ঝড়-বৃষ্টি সহ্য করিতে হয়। যত ছোট থাকা যায় বয়সে বা মনে, ততই ঝড়ের আঘাত কম সইতে হয়।···আপনিও ধৈর্য্য ও গুরুপাদপদ্মে নির্ভর করিয়া সহনশীল হইয়া থাকুন ;

তবেই শান্তি পাবেন-এবং সাধনভজন করতে পারবেন। ধোপা বাড়ীতে কাপড় দিয়ে যেমন নির্ভাবনায় থাকতে পারেন (অর্থাৎ সঠিক জানেন ধোপা সময়মত কাপড় পরিষ্কার ক'রে আপনাকে পরিষ্কৃত কাপড় দিয়ে যাবে) তদ্রূপ কাপড়-রূপ মন ধোপা-রূপ গুরু। গুরুর বাড়ীতে মন দিয়া নির্ভাবনায় বসে থাকেন, দেখবেন সময়মত গুরুদেব আপনাকে পরিষ্কৃত মন দিয়া যাবেন। পরিষ্কার করিতে যতটুকু আছাড় দেওয়ার প্রয়োজন তাহা অবশ্যই দিবেন। সে জন্য বিচলিত হ'লে চলবে না।

[৪]

মন বিক্ষিপ্ত হওয়াই স্বাভাবিক। ইহাকে অভ্যাস দ্বারা বশে আনিতে হইবে। অভ্যাস হইলে ক্রমশঃ স্বভাবে দাঁড়াইবে। অভ্যাস করিতেও না পারিলে গুরুজীর উপর আত্মসমর্পণ করিয়া বসিয়া থাকিতে পারিলেই হয়। সময়ে সবই হইবে এই আশা মনে রাখিয়া সাধনভজন করিয়া যান।

[৫]

সাধনভজন যাহা চলিতেছে তাহা তাঁহারই ইচ্ছায় জানিবেন। তাঁহার ইচ্ছা হইলে তিনি অধিক করিয়াও করাইয়া লইতে পারেন। কম বেশী যাহার পক্ষে যেরূপ প্রয়োজন তাহা তিনিই করাইয়া নেন। তাহাতেই জীব ক্রমশঃ কল্যাণের পথে অগ্রসর হয়। তজ্জন্য অস্থির হওয়া অনাবশ্যক। সময়ে যাহা

করিবার তাহা তিনিই করিবেন এই মনে করিয়া সর্ব্বদা তাঁহার শরণাপন্ন হইয়া থাকাই শ্রেয়স্কর।

[৬]

আশা করি ভগবৎকৃপায় সকলেই আনন্দে আছেন। গুরুপ্রদত্ত মন্ত্র নিষ্ঠাপূর্ব্বক জপ করিলেই আনন্দ পাওয়া যায়। আপনারা মহৎ জনের আশ্রয়, কৃপা পেয়েছেন। তাঁরই প্রদত্ত শক্তিদ্বারা তাঁকে অনুভব করিতে ব্যাকুল হন। ব্যাকুলতা আসিলেই তাঁকে অনুভব করতে পারবেন। গুরুর উপর নির্ভর করিয়া আপনারা নির্ব্বিঘ্নে এই ভবসমুদ্র উত্তীর্ণ হইতে পারিবেন। সাধনভজনের প্রথম সোপান গুরুর উপর নির্ভরশীল হওয়া। সেই নির্ভরতার জন্য গুরুর নিকটই প্রার্থনা, প্রাণের আকুলতা জানাতে হবে। অত্র মঙ্গল। ভগবৎ কৃপায় কুশলে ও আনন্দে থাকেন এই ইচ্ছা করি।

মা, তোমার আশীর্ব্বাদের সঙ্গে এই ক্ষুদ্র গ্রন্থে তোমার লীলাকথা সমাপ্ত করিলাম।

প্রীয়তাং পুণ্ডরীকাক্ষঃ সর্ব্বযজ্ঞেশ্বরো হরিঃ।
তস্মিং স্তুষ্টে জগত্তুষ্টং প্রীণিতে প্রীণিতং জগৎ॥

শেষ

শ্রীশ্রীমায়েরলীলাখেলা

"আমার জীবনের মধুময় দিনগুলি"

ওঁমা

আমার আদরের মামণি সোনামণি

আজকের দিনে তুমি আমাদের সবার ভক্তিপূর্ণ প্রণাম ও আদর গ্রহণ করো। আজকের এই পুণ্য তিথিতে তোমার 'মামণি' তোমার পায়ে তার 'মধুময় দিনগুলি' অর্পণ করিল। তুমি দয়া করিয়া গ্রহণ করিয়া তোমার 'মামণি'কে কৃতার্থ করিও।

"দেবার মত যা ছিল মোর
নাই কিছু আর হাতে
তোমার আশীর্ব্বাদের মালা
নেবো কেবল সাথে"—

গুঁরু পূর্ণিমা
তিনসুকিয়া

ইতি—
তোমার হেনা

আমাদের জীবনে অনেক ঘটনা ঘটে যা সত্যিই অদ্ভুত, যার কোনও মানেও আমরা খুজে পাই না। শুধু ভাবি কি করে

এমন হয় ? এ যে তাঁরই লীলা এটা যেন বুঝেও বুঝতে চাই না বা মেনে নিতে ইচ্ছে হয় না। অবিশ্বাসী মন আমাদের। সহজে কি বিশ্বাস হয় ? চোখে আঙ্গুল দিয়ে বা হাতে কলমে দেখিয়ে বলছেন—ভয় কি ? এই তো আমি আছি। ডাকার মতো ডাকলে ভক্তের আহ্বানে না এসে কি পারি আমি ?—তবু মন মানে কই ? এই তো বেশ কিছু দিন আগের ঘটনা। নতুন বিয়ে হয়েছে। এসেছি স্বামীর ঘর করতে। সংসার কি করে করতে হয় কিছুই জানি না। উনি বেতন পেয়ে সবকটি টাকা আমার হাতে দিলেন। যখন যা দরকার আনাচ্ছি। এ টাকা তো আর লক্ষ্মীর টাকা নয় ? এর শেষ আছেই। হঠাৎ কখন শেষ হয়ে গেছে তা কি আর লক্ষ্য করেছি ? যদিও সংসারও করছি, সব কাজই যখন যা করবার করছি তবুও ভবিষ্যৎ ভেবে মনটা অনাবিল আনন্দে ভরে যাচ্ছিল। কারণ আমাদের স্নেহময়ী মা সবার অলক্ষ্যে ছোট্ট একটি শিশু গড়ে তুলছিলেন তাঁর সন্তানদ্বয়কে দেবার জন্য, যার নাম হবে তাপসকুমার। ভাল ছেলে পেতে হলে মাকেও নাকি ভাল চিন্তা করতে হয় তাই সময় পেলেই, মানে একটু নিরিবিলিতে বসলেই আমার। সামনে তখন ভেসে উঠতো খুব সুন্দর একটি ছেলের মুখ যাকে দেখতে ঠিক তাপসকুমারের মত। তাই বলছিলাম মন তো তখন ঠিক মনে ছিলনা—সে অনবরতই ডানা মেলে উড়তে চাইছিল। এমনি একদিনে হঠাৎ উনি বললেন—টাকা দাও বাজারের। বাইরে রোহিণী (পিওন) দাঁড়িয়ে আছে থলে

হাতে নিয়ে। আর একটা লিস্ট্ করে দাও কি কি আনতে হবে? লিস্ট্ নিয়ে রোহিণীকে দিয়ে গেলাম ব্যাগ খুলে টাকা আনতে—ওমা ব্যাগ যে খালি—একটা টাকা দূরের কথা—ফুটো পয়সাও একটা নেই। বার বার ব্যাগটাকে ঝাড়ছি কিন্তু 'কাকস্য পরিদেবনা'। এদিকে আমার দেরী দেখে উনি বলছেন—"কই টাকা দাও।" আমি তখন একবার এঘর একবার সে ঘর করছি। তারপর চুপ করে ট্রাঙ্কের সামনে হতভম্বের মত দাঁড়িয়ে আছি। একটু পরে রোহিণী এসে বললো—"কই টাকা দিন মা।" "আমি—" "এই যে বাবা দিই—" বলে ব্যাগটা টেনে নিয়ে যেন টাকা বার করছি এমনি ভাবে উপুড় করতেই অবাক কাণ্ড। গোটা তিনেক টাকা ও কিছু ভাঙ্গানি পড়লো। আমি বিস্ময়ে হতবাক্ হয়ে রোহিণীর কাছে সবগুলি দিয়ে দিলাম। ও বেচারা তো কিছুই জানে না। সে টাকা নিয়ে বাজারে চলে গেল। এদিকে আমি ভাবছি কি করে এমন হলো? তখন আমার আস্তে আস্তে মনে হলো যে—যখন আমি ট্রাঙ্কের সামনে চুপচাপ দাঁড়িয়ে ছিলাম তখন আমি আকুল প্রাণে মাকেই ডাকছিলাম—"কি হবে মা? কি লজ্জা বলো? নতুন বৌ—কি করে বলি একটি পয়সাও নেই? সেই ডাকটা বোধ হয় খুব অন্তরের থেকে হয়েছিল। তাই মা দয়া ক'রে আমার সেদিনকার বাজার করার যা দরকার দিয়ে, কৃপা ক'রে অত্যন্ত অদ্ভুত ভাবে তাঁর সব সময়েই আমাদের কাছে উপস্থিতির কথা বুঝতে দিলেন। পরে আমি ওঁর কাছে সব

ব্যাপার খুলে বললাম। তারপর আমরা দুজনে মাকে প্রণাম করলাম। এখনও আমি ভাবি মাগো—সেদিন তুমি কত বড় লজ্জার হাত হতে আমায় রক্ষা করেছ।

আমার একটি মস্তবড় গর্ব্ব যে আমি যখন যা চাই কৃপাময়ী মা আমার তখনই তা দেন। এ আমি সবাইকে বলি ও আবার আমার অন্তর দিয়ে উপলব্ধি করতে পারি। এটাও বেশ আগের ঘটনা। মা তখন তাঁর সন্তানদ্বয়কে "তাপস কুমার" উপহার দিয়েছেন। আমরা তখন শিশু তাপসকে নিয়ে বিন্নাগুড়ি চা বাগানে আছি। খুব বিরাট বাংলো। আমাদের ঘুমোবার ঘরের সামনে ছোট একটি ঠাকুর ঘর। পূজারী এক নেপালী দারোয়ান। খুব সুন্দর একটী শিবের মূর্ত্তি। ঘরটা খুব স্নিগ্ধ ভাবাপন্ন ছিল। সময় পেলেই আমি ও আমার দেওর পানুকে নিয়ে ঐ ঘরে বসতাম। একদিন কথা প্রসঙ্গে দেবব্রত বাবু, শানু এদের আমি বলছিলাম "আমি কখনো প্যাঁচা দেখিনি। দেখলে বেশ হত।" ওরা আমায় খুব ক্ষ্যাপাল। "আসবে প্যাঁচা তোমাকে দেখা দেবার জন্য?" আমি চট্ করে শিবঠাকুরকে প্রণাম করে বেশ একটু আকুল ভাবেই বললাম—"দেখাও না? আমার প্যাঁচা দেখতে খুব ইচ্ছে করে।" একটু পরে ওরা বললো—"ঐ তো বৌদির ঘরের দরজায় একটা প্যাঁচা? আমি দৌড়ে গিয়ে "কই দেখি"? বলে সেখানে গিয়ে দেখলাম আমার ঘুমোবার ঘরের ভেতরের দরজায় খুব

সুন্দর একটা পঁ্যাচা বসে আছে। রংটা প্রায় সাদা, বড় বড় চোখে আমার দিকে তাকিয়ে আছে। আমি প্রায় ৫।৭ মিনিট মন দিয়ে কাছে গিয়ে দেখলাম। তারপর ছোট-বেলায় শুনেছিলাম বলতে হয় "পঁ্যাচারে পঁ্যাচা বুল্‌কী দে" তাও বললাম। তখন প্যাচাটা ঘাড় ফুলালো কয়েকবার। তারপর আমি বললাম—"হয়েছে আমার দেখা—আর দেখতে চাই না।" কি আশ্চর্য্য! অমনি পঁ্যাচটা উড়ে চলে গেল। দেবব্রতবাবু, বিনয়বাবু, প্রমথবাবু প্রমুখ ব্যক্তিরা বলতে লাগলেন—"পঁ্যাচাটা ঘরে ঢুকেছে। দেখবেন কি রকম অমঙ্গল হয়।" আজ পর্য্যন্ত তাঁর কৃপাতে আমাদের সেই পঁ্যাচার জন্য কোন অমঙ্গল হয়নি।

তাঁর কথা কি আমরা লিখে বা বলে শেষ করতে পারি? এটা হল অনেক আগের কথা আমাদের পরম স্নেহময় পিতাজীও তখন বর্ত্তমান ছিলেন। এ ঘটনার সংগে অবশ্য তিনি জড়িত ছিলেন না। ঘটনাটি যে অনেক আগের এবং তখন আমি বেশ ছোট ছিলাম এটুকু বোঝানর জন্যই এই ছোট লাইনটির অবতারণা। যাক্—

আমরা, মানে মামণি, মা, সন্ধ্যা গৌর, প্রসাদ ছিল কি না মনে নাই—একবার হবিগঞ্জে সুন্দর জেঠামণির বাসায় ছিলাম। যাদের দুজনকে নিয়ে আমার এ ঘটনা—তার মধ্যে একজন হলেন আমাদের পরম স্নেহময়ী মাতাজী অপরজন সামান্য মানবী মাত্র। জানি না তিনি এ ঘটনা শুনে কি

বলবেন। কিন্তু মা যেমন তাঁর বইয়ে জোর দিয়ে বলেছেন যে তিনি ঈশ্বরকে নিশ্চয় দেখেছেন আমিও তেমনি জোর দিয়েই বলছি "আমিও স্পষ্টই দেখেছিলাম এবং বিস্ময়ে অভিভূত হয়ে অন্য বোনদের দেখাতে এনেছিলাম।" হ্যাঁ, অপরজন হলেন দিদিমণি (স্বর্ণদি)। কদিন যাবতই আমি, ছোড়দি, (মীনা) ও লীলা লক্ষ্য করছিলাম যে তাঁর সংগে যেন দিদিমণির খুব বেশী ভাব। সারাদিন ওদের গল্প চলছে। রোজ তুপুরবেলা মাতুর পেতে দরজা বন্ধ করে ওরা যেন কি একটা করে। সবাই বলবে —"কি আর করবে? ঘুমোয়।" তবু আমাদের ভীষণ চিন্তা —"উঁহু, একটা কিছু ব্যাপার আছে।" "আচ্ছা, দেবীদি আর স্বর্ণদি কি করে?" লীলার প্রশ্ন! এ ভাবেই চললো ২।৩ দিন। আমার তখন ভীষণ কৌতূহল হল—" নাঃ দেখতেই হচ্ছে জিনিষটা—"ঐ তো রে ছোড়দি একটা জানালা আছে ভাঙ্গা। এটার ফাঁক দিয়ে দেখি আয়।" "আমি যাব না—যদি দেখে ফেলে? বাব্বা—তুই যা।" ছোড়দি বললো। তুপুর বেলা— বাড়ীর সবাই ঘুমাচ্ছে। আমাদের ও ঘুমোবার কথা। একেই ঘুমোই নি তার উপর সত্যি যদি কেউ দেখে ফেলে, বিশেষ করে ওরা? তবে বেশ বড় শাস্তি পেতে হবে। কিন্তু কি জোর মনের ইচ্ছা যে তখন? শেষ পর্য্যন্ত তখন সব কিছু উপেক্ষা করে আমি একাই গেলাম। ছোড়দি আর লীনা বেশ একটু দূরে দাঁড়িয়ে আছে।

খুব আস্তে আস্তে পা ফেলে চুপি চুপি যাচ্ছি। ভাবছি দোষ

তো কিছু নয়—একটু ভাঙ্গা জানালাটা দিয়ে উঁকি মেরে দেখেই চলে আসবো। এখনও আমার বেশ মনে আছে, কী অসহ্য গরম, রোদ্দুরে আস্তে আস্তে পা ফেলছি—নিজের বুকের টিপ্ টিপ্ শব্দ নিজেই শুনছিলাম। জানলাটার কাছে পৌঁছে ওদের দিকে মানে ছোড়দি ও লীনার দিকে তাকালাম। ছোট্ট তো! সত্যি দেখলাম কোথায় মামণি? দিদিমণি ঘুমিয়ে আছে আর তার পাশে ছোট্ট একটি শিশু। মুখটা বেশ বড় অনেকটা। মামণি যখন আগে হাঁটু মুড়ে নাড়ুগোপাল হতেন তাঁর মত। কিন্তু বুকের কাছ হতেই ছোট্ট একটি ২।৩ মাসের শিশুর মত। খুব সম্ভব আমি ৬।৭ সেকেণ্ড দেখেই চমকে ভীষণ অদ্ভুত ভাবে দৌড়ে ওদের কাছে গিয়ে হাঁপাতে হাঁপাতে সব বললাম। আমি তখন খুব জোর কাঁপছি। ওরা কি বিশ্বাস করে? আমার কাঁপুনী আর মুখের ভাব দেখে ওরাও দেখতে চললো। আমি আর যাইনি। ওখানেই ধপাস্ করে বসে পড়েছিলাম। ছোড়দি দেখতে পায় নি। লীনা বলেছিল সে-ও নাকি পরে দেখেছিল। আমায় তখন ওদেরকে দেখেছে কি না জিজ্ঞেস করার ক্ষমতা ছিল না। আরো মজা এত বড় ঘটনাটা আমি ছোড়দি ও লীনাকে ছাড়া আজ পর্য্যন্ত কাউকে বলিনি। ওদের মনে আছে নিশ্চয়ই। এখন লিখতে বসে সেই চেহারাটা চোখের সামনে ভাসছে। মুখে আঙুল দিয়ে চুষছে আর পা দুটোকে ভীষণ জোর নাড়ছে। কেউ বিশ্বাস করবে? বলবে "যতো অদ্ভুত বাজে গল্প।"

এ রকমই অনেকটা। আর একটা ছোট্ট ব্যাপার। তখন আমি ১২।১৩ বছরের। একদিন খুব ভোর বেলা উঠেছি। ফুল তোলার জন্যই বোধ হয়। এটা বরকান্তাতে ঘটে। বাইরে বাগানে যাবার আগে (বাসার একটি বড় 'গেট' ছিল বাঁশের) গেট দিয়ে নয় তো বসবার ঘরের ভিতর দিয়ে যেতে হত। ঐ ঘরে দাদারা ঘুমোচ্ছে। যাক্ আমি উঠেছি আর সবাই বিছানায় এমন কি মামণিও। বড় গেটটা খুলে বাইরে যাবো হাতে ফুলের সাজি। বেশ একটু অন্ধকার ভাব। মুখটা বাড়িয়েই আমার বাঁ দিকে, যে দিকে অন্নদাবাবুর বাসাটা ছিল সেখানে দেখি কি—"আকাশী রংএর খুব বড় একটা মূর্ত্তি আমাদের বাসার দিকে এগিয়ে আসছে। অনেকটা মা তুর্গার যেমন কাঠামো হয়—এক সঙ্গে সব—(তুর্গা, লক্ষী, সরস্বতী, কার্ত্তিক, গণেশ) সে রকম শুধু রংটা অন্য। যখন পণ্ডিত মশাইর বাসার কাছে এসে পড়েছে তখন আমার ভীষণ কাঁপুনী হচ্ছে। গেট্টা বন্ধ করে ওখানেই দাঁড়িয়ে আছি। ফিরে আসার ক্ষমতা নেই। অনেকক্ষণ দাঁড়িয়েও আর মূর্ত্তিটিকে বেড়ার ফাঁক দিয়ে চলে যেতে দেখলাম না। প্রায় মিনিট দশেক দাঁড়াবার পর বাবা উঠছেন দেখে আস্তে আস্তে আবার ফুল তুলতে যাবার জন্যে গেট খুললাম। ভীষণ ভয় পেয়েছিলাম উঃ—। এখনও আমি ভোরবেলা দরজা বা গেট খুলতে গেলেই সেই মূর্ত্তির কথা মনে হয়। সামনে যেন ভেসে উঠে ! এটাও কি তাঁরই কৃপা ? বলতে সাহস পাই নি এতদিন। আজ মধুময় দিনগুলি' লিখতে গিয়ে মনে হল।

এবারের ঘটনাগুলি কোলকাতাতেই ঘটে। এবং সবই ৯বি, বালীগঞ্জ প্লেসে।

মামণির বিছানা গরমের জন্য বাইরে ঠাকুঘরের বারান্দায় করে দিতাম। সেদিন বিছানা তুলতে গিয়ে দেখি—তাঁর বালিশের ওপরে ঠিক যেখানে মাথা রাখেন—মানে তোয়ালেটির ওপরেই একটা অদ্ভুত রকমের পোকা। দেখতে অনেকটা কেল্লার মত (কেন্নার মত)—তবে রংটি সবুজই বেশী তার মধ্যে খুব সামান্য খয়েরী ভাব। বেশ লম্বা। পা কেন্নোর মত একগাদা। ভীষণ ভয় পেয়ে ডাকলাম—"গৌর এটা ফেলে দে না ভাই" "ও বাবা—এটা কি? ফেলে দে, ফেলে দে, করছিস—ফেলবো কি দিয়ে?" "এই তো। মামণির পাখাটার ওপর এটাকে তুলে বাইরে ফেলে দিবি। নে ধর।" গৌর শ্রীমান ত আমার কথা মত এটাকে দোতলা থেকে নীচে একদম ঘাসের ওপরে ফেলে চলে গেল পড়তে।

এদিকে আমাদের চেঁচামেচিতে মামণি বাথরুম থেকে এসে বললেন—"কি হয়েছে? এতো গোলমাল কিসের?" সব বললাম। মামণি—"এ্যাঁ ফেলে দিয়েছিস? আমাকে ডাকলি না কেন? একদম নীচে?" "ডাকব কি করে তুমি ত বাথরুমে?" —তখন বললেন—"বেশ বুদ্ধি আছে। পাখাটা দিয়ে ফেলেছে। আবার নিজে ফেলল না—গৌর কে দিয়ে!" আমি তখন ভীষণ অপ্রস্তুত হয়ে গেছি। গৌরকে যেই নীচে পাঠিয়েছি —"দেখে আয় ত আছে না কি?" অমনি মামণির কি হাসি।

"ওপর থেকে ফেলে আবার পাঠান হয়েছে গৌরকে আছে নাকি দেখার জন্য।" আবার হাসি। পরে শুনেছিলাম তিনি একজন মহাপুরুষ। না—গৌর গিয়ে আর তাঁকে পায় নি।

এবার বিয়ের পরে। আমি তখন ৯ বি'তেই আছি। হঠাৎ একদিন 'উনি' এলেন। রাত্তির বেলা যথারীতি বাইরের ঘরটাতে ঘুমোতে গেছি। দাদা, মা, ওরা সব পাশের ঘরে। মামণি বাড়ীতে নেই। কোথায় যেন গেছেন। জায়গাটার নাম মনে নেই। কি একটা বিষয় নিয়ে আমাদের দুইজনের মধ্যে বেশ জোর তর্ক চলছে। কেউ-ই ঘুমাতে পারছি না। রাত্রি ২।২॥৹ হবে, হঠাৎ আমি বললাম—"এখন যদি মামণি এসে বলেন তবে তোমার বিশ্বাস হবে তো?" "আসবে তোমার জন্য মামণি! তিনি এখন কলকাতা হতে বহু দূরে।" "ওঁদের ইচ্ছে হলে এ আর এমন বেশী কি?" বলতে না বলতেই বারান্দার লাইট হঠাৎ জ্বলে উঠলো। আমি চুপ করে আছি। ভাবলাম কেউ মানে দাদা, মা এরা কেউ বাথরুমে যাচ্ছেন। আমাদের ঐ বাড়ীতে যে কেউ বাথরুমে ঢুকতে বা বেরোতে আমরা টের পেতাম। কারণ দরজাটা খুলতে বা বন্ধ করতে বেশ জোর একটা শব্দ হতো। যাক্, চুপ করে আছি, কারণ আমি চাইছিলাম না যে আমাদের এই দাম্পত্য কলহ অন্য কেহ শুনতে পাক। বেশ কিছুক্ষণ অপেক্ষা করার পরও দরজা খোলা বা বন্ধ হবার কোন শব্দ পেলামনা। তখন ভাবলাম তাহলে কি 'চোর' এলো? চোরের কথা মনে হতেই বাইরের দিকের

বারান্দা দিয়ে দাদা ওদের ঘুম ভাঙ্গিয়ে জিজ্ঞেস করলাম "বারান্দার আলো তোমরা কেউ জ্বালিয়েছ ?" সবাই অবাক মা, দাদা, দাদামণি সবাই বলে উঠলো—"আমরা তো ঘুমোচ্ছি ! তুই তো এসে ডেকে তুললি ? তখন এক হৈ চৈ কাণ্ড। দাদা দিদিমণি লাঠি নিয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে সব জায়গা খুঁজে এলো এমন কি ছাতের দরজা খুলে ছাত পর্য্যন্ত দেখে সিঁড়ি দিয়ে নামতে নামতে বললেন—না ; কেউ কোথাও নেই। কি আশ্চর্য্য, তাহলে আলোটা কে জ্বাললে ?" তখন আমি বলে উঠলাম মামণির কাণ্ড নয় তো ? হয়তো এত রাত্রে এসেও বুঝিয়ে দিলেন যে আমি সব সময়ই সব জায়গায় থাকি। ইচ্ছে করলে হাজার মাইল দূর হতে আসাটাও আমার পক্ষে কিছুই নয় !" বলে ওর দিকে একটু অর্থপূর্ণভাবে তাকালাম। মাও বললেন—"আমারও মনে হয় মা-ই এসেছেন।" আর সবাই মার কথা সমর্থন করে মনে মনে মামণিকে প্রণাম করে শয্যা গ্রহণ করলো। আমরাও এসে বিছানায় শরীরটাকে ছেড়ে দিলাম। বড় ক্লান্ত হয়েছিলাম। শুতে শুতেই নিদ্রাদেবী তার কোলে আমাকে টেনে নিলেন। কিছুদিন পর শ্রীশ্রীমা তাঁর দেশভ্রমণ সাঙ্গ করে ফিরে এলেই সবাই প্রশ্ন করলাম। তাঁর সেদিনকার মিষ্টি মধুর দুষ্টুমিভরা হাসিই আমাদের যা কিছু বোঝার বুঝিয়ে দিল। উত্তর পেয়ে গেলাম। আর শ্রদ্ধা, লজ্জা, ভক্তিতে তাঁর চরণে আমার মাথা নুইয়ে দিলাম।

এবার যা বলছি তা হলো তাপসকুমার আমাদের কোলে

আসার ক'দিন পরের ঘটনা। মা নীচের বাথ্‌রুম হতে স্নান করে ঠাকুর ঘরে গেছেন। মামণি একটু পরে স্নান সেরে এসে বল্লেন—"নীচে একটা অদ্ভুত রকমের পোকা আছে।" শুনে গৌর, প্রসাদ, সন্ধ্যা সবাই দেখে এল। আমারও যাবার খুব ইচ্ছে হল। কিন্তু উপর নীচ করা তখন আমার বারণ ছিল। এদিকে মা পূজো শেষ করে এসে বললেন যে তিনিও দেখেছেন। আমিও আর থাকতে না পেরে মামণির মত নিয়ে পোকাটাকে দেখতে চল্লাম। সিঁড়ি দিয়ে একপা একপা করে নামছি, খুব আস্তে আস্তে। নীচের সিঁড়ির শেষ দুটো তখনো বাকী। দূর হতে একটু চোখে পড়তেই মনে হল সত্যিই অদ্ভুত। এঁর বিবরণ দিতে আমি অপারগ। দেখছি—হঠাৎ মনে হল—যদি লাফ দিয়ে কাঁধে এসে বসে? একথা মনে হওয়া মাত্র আর কি সেখানে দাঁড়াই? ভীষণ একটা ভয় হল যে লাফ দিয়ে কাঁধে আসবেই। পরি কি মরি করে তো উপরে উঠে এলাম। এসে মামণিকে আমার অবস্থা বল্লাম। এর মধ্যে দাদা পায়খানা হতে নীচে গেলেন। দাদা পোকাটির কথা কিছু শোনেন নি। তিনি সেই 'অদ্ভুত দর্শন জীব'টিকে দেখে খুব আস্তে আস্তে জল দিয়ে দিয়ে এটাকে ড্রেনে ফেলে দিলেন। বলতে ভুলে গেছি আমি দেখে আসার সময় পোকাটাকে মনে মনে প্রণাম করে এসেছিলাম। এখন দাদা এসে আবার মামণিকে বললেন যে তিনি একটি অদ্ভুত পোকা দেখে খুব মায়া করে আস্তে আস্তে ড্রেনে ফেলে দিয়েছেন। তখন মামণিকে জিজ্ঞেস করে জানতে

পারলাম যে তিনি হলেন হনুমানজী—মানে মহাবীর। তাই আমার তাঁকে দেখে বারবার লাফ দেবার কথা মনে হচ্ছিল। এটাও তাঁর বিশেষ কৃপা। কারণ সবাই তো দেখেছিল তাঁকে। কারুরই তো লাফ দিয়ে ঘাড়ে চড়ে বসবে এ কথা মনে হয় নি? তা ছাড়া আরো তিনটি সুন্দর ঘটনা আমার প্রায় সময়ই মনে হয় সেই 'অদ্ভুত রিজার্ভেশন' 'অপ্সরার মামণিকে চুল বেঁধে দেওয়া, আর 'তিলক যাহা মণির স্পর্শ'—মনকে আমার মাঝে মাঝে এত উতলা করে ফেলে যে, কি বলবো?

স্নুচিত্রা দাস

গল্প হলেও সত্যি

"আমাদের মা" বলতেই সমস্ত মন প্রাণ এক অদ্ভুত আনন্দ বেদনা-মিশ্রিত চোখের জলও এসে পড়ে এই ভেবে যে, মা তো শুধু আমার একারই মা নন্। সমস্ত বিশ্বের মা। বিশ্ব প্রসবিনী যিনি সেই জননী মোদের মা," তাঁর সন্তান আমরা, নিয়তই কতো কষ্ট দিচ্ছি তাঁকে, নানা প্রকার অন্যায় কাজ করে। তবুও একবার একটু আকুলভাবে ডাকলেই তিনি হাসিমুখে সবকিছু ক্ষমা করে অভয় দেন। আশ্রয় দেন তাঁর মধুময় কোলে। মা, মাগো—তুমি কতো ভাবে কৃপা করেছ তোমার মামণিকে, তার হিসাব রাখার সাধ্যি কি আমার আছে? মনে রাখারই বা ক্ষমতা কোথায়? শুধু তুমি কৃপা করে যতোটুকু বুঝতে দিয়েছ ততটুকুই না বুঝেছি? আর তা ভাষা দিয়ে রূপ দেবারই কী ক্ষমতা আছে এ দীন হীনার? কি আছে তার? তুমি কৃপা করে 'মামণি' বলে ডেকেছ, এই আমার মস্ত গর্ব্ব, মস্ত বড় অহংকার। "সকল গর্ব্ব দূর করে দিব, তোমার গর্ব্ব ছাড়িব না।" সমস্ত বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডের যিনি সৃষ্টি-কারিণী, সেই মহামায়া-মার সন্তান আমি, তাঁর মামণি। কেন???

১৯৫৩ সনে শ্রীমা এসেছেন মরিয়াণীতে শরৎভাইয়ের বাসায়। আমাদেরও যাবার জন্য লিখেছেন মামণি। যথাসময়ে আমরা, মানে উনি, মিঠু, তাপস, তিলক ও আমি মরিয়ানী রওনা

হলাম। তিলকের বয়স মাত্র ১ মাস ১ দিন। ওখানে গিয়ে তো খুব হৈ চৈ করে দিন কাটছে। সুযোগ পেলে যখনই মার ঘরে গিয়ে বসতাম, (ছুদিকে মিঠু ও তাপস, কোলে তিলক) মা ঠাট্টা করে বলতেন—"ঠিক যেন মা ষষ্ঠী" কখনও বলতেন— "তিলকটা বেঁচে থাকলে ঠিক শান্তুর মত হবে। কি লম্বা চওড়া হাত পা।" হাসি গল্পের মধ্য দিয়ে দিন কাটছে বেশ। শ্রীমা একদিন বললেন—"কাল তিলকের মুখে ভাত দিয়ে দেওয়া যাক।" আমি সবিস্ময়ে বলে উঠলাম—"সে কি ওর তো মাত্র ১ মাস কদিন বয়স ?" সন্ধ্যা বললো—তাতে কি হয়েছে ? রাজারও তো মুখে ভাত দিল সেদিন বীণাদি ? মামণির প্রসাদ খাইয়ে দে।" ব্যস্—পরদিন তো ওকে খুব সুন্দর করে সাজিয়ে তিলক কেটে, শ্রীমার কাছে আনলাম। শ্রীমা ওর মুখে ভাত দিলেন। একটু পরে বললেন—"হেনা, দে তো তিলককে একবার কোলে নিই, নইলে তো তোর মনে একটা ছুঃখ থাকবে যে দিদি একবারও ওকে কোলে নিল না ?" মামণি ওকে কোলে নেবেন এই আনন্দে আত্মহারা হয়ে তাড়াতাড়ি তিলককে এনে শ্রীমার কোলে দিলাম। তখন তো আর এটা বুঝতে পারিনি যে তিলককে মার চিরদিনের জন্যই কোলে নেবারই সময় হয়ে এসেছিল ? যাক্—তারপর তিলককে নিয়ে আমরা করিমগঞ্জে চলে এলাম। এসেই ওর খুব অসুখ করলো। মামণির ফটোর সামনে শুয়ে, মামণির তৈরী ফ্রক পরে সে চলে গেল তার জাগতিক মাকে ছেড়ে পরম আনন্দময়ীমার মধুময় কোলে। তারপর শ্রীমা লিখলেন—"* * * * তোমরা আমাকে পুত্ররূপে গ্রহণ করো।" সেই থেকেই বিশ্বমায়ের মামণি আমি।

সুচিত্রা দাস

মাধুকরী

শ্রীশ্রীমার সঙ্গে ভ্রমণ করার সময়ে আমার গুরু ভাইবোনদের অনেকেরই বিচিত্র অভিজ্ঞতা হয়েছে। শ্রীমার কৃপায় অনেকেই বহু দেবদেবী ও মহাপুরুষের দর্শন লাভ করেছেন। একবার আমারও সেই সৌভাগ্য লাভ হয়েছিল। স্মৃতির ঝাঁপি খুলে আজ সেই সৌভাগ্যের কাহিনী ভাইবোনদের শোনাতে বসেছি।

সেবার ১৯৫৫ খৃঃ অক্টোবর মাসে শ্রীমা হঠাৎ পুরী যাওয়া ঠিক করলেন। সেই অনুসারে শ্রীমা ৺কাশী থেকে কলকাতা রওনা হলেন এবং একবেলা কলকাতায় কাটিয়ে পুরীর দিকে যাত্রা করলেন। কলকাতা থেকে আমি, সন্ধ্যাদি, গৌর, দিদিমণি (কণা), আভাদি, হেনাদি, ভক্তিদি ও মণিদা প্রভৃতি অনেকেই শ্রীমার সঙ্গী হলাম। আমাদের মধ্যে মণিদা ব্যতীত এর আগে কারো ৺পুরী যাওয়ার সৌভাগ্য হয়নি। একে শ্রীমার সঙ্গে যাওয়া এবং তদুপরি জগন্নাথদেব ও সমুদ্রদর্শন, সুতরাং আমাদের উৎসাহ ও উদ্দীপনা সহজেই অনুমেয়।

৺পুরী পৌঁছে মহা উৎসাহে আমরা দ্রষ্টব্য স্থানগুলি দেখে বেড়াতে লাগলাম। প্রায় রোজই আমরা সকালে অথবা বিকালে সমুদ্রতীরে বেড়াতে যেতাম। এর মধ্যে একদিন বিকালে আমরা সমুদ্রতীরে বেড়াতে গিয়েছি। আমরা সবাই

সমুদ্রপারে গোল হয়ে বসে বালু নিয়ে খেলা করছি। এমন সময় আভাদি মামণিকে বললো যে—"মা তোমার সঙ্গে বেড়াতে গিয়ে কত জনে মহাপুরুষ অথবা দেবদেবীর দর্শন লাভ করেছে। আমাদের তো এবার তুমি কাউকে দেখালে না?" এই বলে আভাদি মা'র কাছে আবদার করতে লাগলো। আমাদের মধ্যে তখন অনেকেই আভাদির সঙ্গে যোগ দিল। শ্রীমা কিছু না বলে মৃদু মৃদু হাসতে লাগলেন। হঠাৎ এক সময় শ্রীমা দাঁড়িয়ে উঠে বললেন যে "চল, একটু বেড়িয়ে আসি। আমরা তখন সবাই উঠে শ্রীমার সঙ্গে সমুদ্রতীর ধরে স্বর্গদ্বার অভিমুখে যেতে লাগলাম। কিছুক্ষণ যাওয়ার পর শ্রীমা হঠাৎ বলে উঠলেন—দেখো, "দেখো, একটা লোক কেমন অদ্ভুতভাবে জলের উপর দিয়ে হেঁটে যাচ্ছে?" আমরা সবাই তাকিয়ে দেখলাম, আমাদের আগে আগে তীরের কাছেই ঢেউয়ের মধ্যে দিয়ে একজন আস্তে আস্তে সমুদ্রের দিকে এগিয়ে চলেছে। শ্রীমা আমাদের বললেন—"দ্যখো কি আশ্চর্য্য! জল তাঁর পায়ের গোড়ালার বেশী উঠছে না।" আমরা তখন সবাই লক্ষ্য করলাম সত্যিই তো কি আশ্চর্য! সমুদ্রের উত্তাল তরঙ্গ উদ্দাম বেগে এসে তাঁর পায়ের গোড়ালী স্পর্শ করে চলে যাচ্ছে। সমুদ্রের এই বড় বড় ঢেউও তাঁর পায়ের গোড়ালী ছাড়িয়ে উঠতে পারছে না। এমনি ভাবে কতটা হেঁটে গেলো। কেউ কেউ আবার দেখলো ইনি যেন জলের উপর দিয়ে হেঁটে যাচ্ছেন। শ্রীমা লোকটির পানে আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করায় দিদিমণির কেন জানি মনে একটু

সন্দেহের উদয় হলো। তাড়াতাড়ি দিদিমণি বললো—'তোমরা এঁকে নমস্কার করো, ইনি বিশেষ কেউ হতে পারেন।' তখন আমরা সবাই তাঁকে প্রণাম করলাম। লোকটি কিন্তু কোনদিকে না তাকিয়ে সোজা সমুদ্রের দিকে এগিয়ে যাচ্ছিলেন। আমরা সবাই শ্রীমাকে অনুরোধ করতে লাগলাম ইনি কে তা প্রকাশ করবার জন্যে। আমাদের সবার মনেই তখন দৃঢ় ধারণা যে, ইনি নিশ্চয়ই বিশেষ কেউ হবেন। আর সব চেয়ে আশ্চর্য্য লাগছিল যে, কেমন অবলীলাক্রমে লোকটি সমুদ্রের গভীরের দিকে এগিয়ে যাচ্ছেন। ঢেউয়ের আঘাত একটুও তাঁকে বিচলিত করছে না। এই সময়ে শ্রীমার আদেশে আমরা ফিরে চললাম। কিন্তু আমরা সবাই ঘাড় ফিরিয়ে লোকটিকে দেখতে লাগলাম। তখন শ্রীমা বললেন, 'ইনি সমুদ্রদেব। কৃপা করে তোমাদের দর্শন দিলেন।" এই শুনে আমরা সবাই আবার তাঁকে প্রণাম করলাম। কিন্তু অবিশ্বাসী মন, সহজে কি আর মানতে চায়? সাধারণ মানুষ আমরা, অলৌকিকত্ব না দেখলে সহজে কিছু বিশ্বাস করতে পারি না। মনের কোণে বুঝি তাই কেমন একটা অবিশ্বাস দেখা দিল। ইনি যে সমুদ্রদেব তার প্রমাণ কি? সাধারণ মানুষও তো হতে পারে! বেশ ইনি যদি দেবতাই হন তাহলে চোখের সামনে অদৃশ্য হন দেখি? তবেই বুঝি বাহাদুরি! মুখেও সেটা প্রকাশ করে ফেললাম। 'আচ্ছা' সন্ধ্যাদি! ইনি হঠাৎ মিলিয়ে গেলে বেশ হয়! আশ্চর্য্য কাণ্ড। আমি এই কথা বলতে না বলতেই দেখি আমাদের সবার চোখের

সামনে লোকটি হঠাৎ সমুদ্রের মধ্যে মিলিয়ে গেল—আর উঠলো না। সমস্ত শরীর কেন জানি কাঁটা দিয়ে উঠলো। একি অবাক কাণ্ড! এও কি সম্ভব? অন্তর্যামী ঠাকুর যেন আমাকেই শিক্ষা দিয়ে গেলেন যে 'ছাখ্ অবিশ্বাস করে প্রমাণ চেয়েছিলি তো কেমন শিক্ষা, আর অবিশ্বাস করবি? আমাদের কারোর মুখে তখন কোন কথা নেই। কিন্তু অবাক হবার পালা আরো কিছু বাকী ছিল। এরপর আমরা আলাপ করতে লাগলাম যে কে কেমন দেখলাম। তখন দেখা গেল যে সমুদ্রদেব আমাদের এক একজনের কাছে এক এক রূপে আবির্ভূত হয়েছেন। আমার তাঁকে একটি সাধারণ মানুষের মতো লেগেছিল। কালো রং নুলিয়ার মতো বেশভূষা। দিদিমণি ও গৌর তাঁর গায়ের রং খুব ফর্সা দেখেছে। সন্ধ্যাদি তাঁর রং দেখেছে মাঝারি মতো। আশ্চর্য্য! একই ব্যক্তি কি করে একই সময়ে আমাদের চোখে বিভিন্নরূপে দেখা দেন। এর কি কোন বিজ্ঞানসম্মত ব্যাখ্যা আছে? আমরা সবাই হতবাক্। তখন আমরা শ্রীমাকে এর কারণ জিজ্ঞাসা করলাম। শ্রীমা বললেন—"যে যার সংস্কার মতো তাঁকে দেখেছো।" সন্ধ্যা হয়ে এসেছিল, আমরাও বেড়ানো শেষ করে বাড়ীর দিকে পা চালালাম। আমাদের মন প্রাণ তখন কি এক গভীর আবেগে আচ্ছন্ন! খালি বার বার মনে হচ্ছিল মাগো! কি তোমার অসীম কৃপা! আমরা বিশেষ কাউকে দেখতে চাইলাম, তুমি সঙ্গে সঙ্গে দর্শন করালে। আবার অবিশ্বাসী মন যখন তা মানতে চাইলো না, তখন তুমি

তার প্রত্যক্ষ প্রমাণও দিলে। এইভাবে কত কৃপা তুমি আমাদের নিরন্তর করছো! কিন্তু এত পেয়েও তো তোমার দেওয়ার মর্য্যাদা রাখতে পারি না। তাইতো এই প্রার্থনাই করি মাগো! তোমার এই স্নেহ ভালবাসা থেকে কোনদিন যেন বঞ্চিত না হই। সেদিনের কথা মনে হলে আজও মনটা কি এক আনন্দানুভূতিতে ভরে ওঠে। সেই আনন্দকণাই আজ ভাই-বোনদের মাঝে ছড়িয়ে দিলাম।

সুজিত রায়
চতুর্থ বার্ষিক শ্রেণী

স্বপ্ন নয় সত্যি

শ্রীশ্রীমা যে সন্তানদের কি ভাবে বা কতভাবে রক্ষা করেন তার নিদর্শন স্বরূপ কয়েক বৎসর আগেকার একটি ঘটনা মনে পড়ছে।

কয়েক দিন ধরে আমার শরীরটা একটু খারাপ যাচ্ছিল। আজ সকাল থেকে শরীরটা বেশী খারাপ লাগছে। যাই হোক সংসারের সব কাজ সারলাম। বিকেল থেকে আমি যেন আর উঠতে পারছি না। সন্ধ্যারতি করে এসে আমি ইজিচেয়ারে বসে আছি আর মনে হচ্ছে যেন বাড়ীতে অনেক লোক এসে বাড়ীটা গম্‌ গম্‌ করছে। আর দেখছি বারান্দাতে কারা যেন চলাফেরা করছে। ঘরেও কিছু লোক আছে তবে তারা আমার খাটের দিকে দাঁড়িয়ে আছ। তবে মেয়েরা সব বেশ সেজেগুজে —তাদের পরণে ফিকে সবুজ রঙের কাপড়। আর আমার ঘরের আলোটা যেন বেশ জোর হয়ে গিয়েছে।

ছেলেমেয়েরা সব পড়ার ঘরে পড়ছে আর আমি একলা বসে বসে ভাবছি ব্যাপার কি? এই রকম হচ্ছে কেন? এমন কেউ আমার কাছে ছিল না যে তাকে ডাকি বা বলি। ছেলেরা সব ছোট, মেয়ে ছোট। তাদের এই কথা বললে বা দেখালে ভয় পাবে সেই কারণেই তাদের ডাকলাম না।

ঠাকুরজীর ভোগ দিতে গেলাম। ভোগ দিয়ে দরজার বাইরে দাঁড়িয়ে জপ করছি। আমার মনে হলো আমি যেন একটী পাহাড়ের চূড়ায় দাঁড়িয়ে আছি। বরফের উপর দাঁড়িয়ে থাকলে যেমন ঠাণ্ডা হাওয়া লাগে সেই রকম খুব ঠাণ্ডা হাওয়া আমার শরীরে লাগছে। আমি কয়েকবার তাকিয়ে দেখতে লাগলাম যে এই রকম ঠাণ্ডা হাওয়া কোথা থেকে আসছে? মনে করলাম শরীর খারাপ বলে এই রকম মনে হচ্ছে। তারপর ঠাকুরজীর শয়ন দিয়ে ছেলেদের খাওয়াতে গেলাম। নিজেও খেয়ে নিয়ে ছেলেদের বিছানা ঠিক করে সবাইকে শুইয়ে এসে বড় ক্লান্ত বোধ করলাম আর শরীরে খুব একটা কষ্ট বোধ হতে লাগলো। আমি না শুয়ে ইজিচেয়ারে বসে পড়লাম। বসে আছি কিন্তু আমার মাথাটা অনবরত কাত হয়ে যাচ্ছে। তখন আমি চেয়ারটীর গায়ে মাথাটী রাখলাম। কিন্তু মাথাটী সেই ভাবেই কাত হতে লাগলো। আমার মাথাটী ঠিক করে রাখবার শক্তি নেই ; আর আমার হাত পা সব ঠাণ্ডা—হাত কনুই অবধি এবং পা হাঁটু অবধি ঠাণ্ডা। তখন আমার মনে হলো আমি আর বাঁচবো না। এরা কি আমাকে নিতে এসেছেন ? কত বার তো অসুখ করেছে এর চেয়ে কত বেশী। এ রকম তো কখনও হয়নি। শরীরের অবস্থা ক্রমশঃ এত খারাপ হ'তে লাগলো যে আমি ভাবলাম আর যদি না উঠতে পারি ? তার চেয়ে এক্ষুণি খাটে গিয়ে শুয়ে পড়ি। মৃত্যু যদি হয় হোক্। যারা খাটের কাছে দাঁড়িয়ে আছে তাদের বেশ দেখতে

লাগছে — ইচ্ছে হচ্ছিল না আলো নিবিয়ে শুয়ে পড়তে কিন্তু আমার তখন বসবার অবস্থা ছিল না। আমি আস্তে আস্তে গিয়ে আলো নিভিয়ে খাটে শুয়ে পড়লাম। এবং তাদের আমার খাটের পাশে মাথার কাছে দেখতে লাগলাম। তাঁরা সব সময় দক্ষিণ দিকে আছেন। আমি শুয়ে শুয়ে বেশ দেখতে পাচ্ছি ঘরটায় চাঁদের আলোর মত আলো। আমি শুয়ে শুয়ে ভাবছি এখন যদি আমার মৃত্যু হয় কি হবে? ছেলেরাতো কিছু জানে না। কি করবে? কোথায় টাকা পাবে? কার কাছেই বা খাবে? আর 'ও' এখন নেই তার একটা কষ্ট চিরকাল থেকে যাবে। লোকও হয়ত—নানান কথা বলবে। তাঁকে কি মা এত বড় আঘাত দেবেন? তারপর কলির কথা মনে হলো। আমার রাত্রে মৃত্যু হবে। সারারাত ও মরার পাশে শুয়ে থাকবে। হয়তো ভয় পেয়ে কেঁদে উঠবে। কে ওর কাছে আসবে? সবাই তো ঘুমিয়ে আছে। তখন মনে হলো যাই মেঝেতে শুই গিয়ে তাতে বিছানাও নষ্ট হবে না আর কলিকেও মরার পাশে শুয়ে থাকতে হবে না। এই রকম নানান চিন্তা আসতে লাগলো তার আর কোন মীমাংসা করতে পারলাম না। তখন সব মার উপর ছেড়ে দিয়ে মৃত্যুর জন্য প্রস্তুত 'নাম' করতে আরম্ভ করলাম আর মাকে খুব ডাকতে লাগলাম। হঠাৎ মনে হলো আমাকে একটি মেয়ে স্বরূপ করে দিচ্ছে। আমি মাকে খুব ডাকতে লাগলাম —একবার তুমি দেখা দাও। তখন উত্তর দিক থেকে হলুদ

রঙের কাপড়পরা মাথায় ঘোমটা দেওয়া খুব সুন্দর একজন আমার দিকে আসতে লাগলো। আমি তাকে দেখেই বললাম —আমি তোমায় ডাকিনি। আমি মাকে ডাকছি। এই বলে আমি চোখ বন্ধ করে 'নাম' করতে লাগলাম। মা বলেছিলেন নামেতে মূর্ত্তি পরিষ্কার হয়ে ফুটে ওঠে। যদি গুরু আসেন তবে তাঁর মূর্ত্তি পরিষ্কার হয়ে ফুটে ওঠে আর যদি অন্য কেউ আসেন তো সরে যায়। সেই কারণে 'নাম' করতে লাগলাম। যদি মা এসে থাকেন তবে আমার কাছে আসবেন, অন্য কেউ যদি হন তো চলে যাবেন। 'নাম' করতে করতে চোখটা আবার খুললাম। তখনও দেখি উনি সে রকম ভাবে দাঁড়িয়ে আছেন। এতে আমার ভীষণ রাগ হল। আবার বললাম—'আমি তোমায় চাই না, আমি মাকে চাই।' বলেই একটু চুপ করে থাকি। তারপর দেখি উত্তর পশ্চিম কোণে অনেক দূরে কাল মেঘের মধ্যে মা দাঁড়িয়ে আছেন। শুধু মা'র মুখখানা দেখা যাচ্ছিল। দেখে আমার খুব আনন্দ হলো। আমি মার দিকে তাকিয়ে 'নাম' করতে লাগলাম। খানিক বাদে দেখি মা একটু এগিয়ে এসেছেন বটে তবে কালো মেঘ সম্পূর্ণ কাটেনি। দেখতে বেশ কষ্ট হচ্ছে। তবে সম্পূর্ণ শরীর দেখা যাচ্ছে না এখন। তারপর মার সঙ্গে নানান্ কথা হলো। মা বললেন—'তুমি ওকে ক্ষমা করেছ? আমি বললাম—'না।' এই ধরণের কতকগুলি কথা হলো আমার সব মনে নেই। আমি বললাম 'আমি এই কাপড় পরে যাব না।' মা—ছিঃ, এই রকম করতে

নেই। তখন আমি নিজের দিকে তাকালাম। দেখলাম একটি বেশ দামী জরি-পাড় শাড়ী আমার পরণে। পায়ের উপরে পাড়টী পড়ে আছে। তখন আমি চিৎ হয়ে শুয়ে আছি। যেমন মৃতদেহ শোয়ান থাকে সেই রকমভাবে শুয়ে আছি।

তারপর দেখি আমার মাথার কাছে কাঠিয়া বাবা দাঁড়িয়ে আছেন। আমি তাঁর পায়ে মাথা রেখে প্রণাম করলাম। তার হাতে একটী কমণ্ডুলু। আমি তাঁর দিকে তাকিয়ে দেখতে লাগলাম আর ভাবতে লাগলাম—ছবিতে কি রকম শক্ত শক্ত চেহারা। এ চেহারা কি সুন্দর! কি সুন্দর মিষ্টি হাসি। খালি গা পরণে কি ছিল মনে নেই। খালি পা। গায়ের রং খুব উজ্জ্বল সোনার মতন। তিনি একটু দাঁড়িয়ে থেকে কমণ্ডুলু থেকে জল নিয়ে আমার গায়ে ছিটিয়ে দিলেন। হঠাৎ এক ফোঁটা জল আমার হাতের চেটোতে পড়লো। পড়ার সঙ্গে সঙ্গে আমি চমকে উঠলাম এবং দেখি সত্যিই এক ফোঁটা জল। মনে হলো কি করে জল এলো! বিষ্টি পড়ছে। উঠে বসে দেখি আকাশে বেশ তারা রয়েছে। মনে হল মশারির মধ্যে টিক্‌টিকি ঢুকলো কি করে? উঠে আলো জ্বাললাম, মশারির ভিতর দেখলাম কোথাও কিছু নেই। আমার শরীরে যেন ক্লান্তিও নেই। আর ঘরে তারাও নেই। ঘরের আলোও স্বাভাবিক জ্বলছে—যে উজ্জ্বলতা নেই। আমি তখন কিছুতেই ভাবতে পারছি না যে কাঠিয়া বাবা, মা সত্যিই কি এসেছিলেন? কিন্তু না-ও করতে পারছি না। তাঁরা যে

এসেছিলেন তার প্রমাণ যে তাঁরা রেখে গিয়েছেন একবিন্দু জলে।

তারপর মাকে জানাই। মা উত্তর দেন ঠাণ্ডা হাওয়া মৃত্যুর ঠাণ্ডা পরশ। মেয়েরা মৃত্যুদূত। কালমেঘ মৃত্যুর ছায়া। মাকে এইভাবে দেখলাম কারণ গুরুজী সবশেষে আসেন। সম্পূর্ণ নির্ভরতার পরে গুরুজী দর্শন দেন। এ-টি পরীক্ষা। "তোমার মৃত্যুযোগ ছিল কাঠিয়া বাবার কৃপায় তোমার একটি জন্ম কেটে গেল।"

মাগো, তুমি এইভাবে কত জনকে কত কৃপাই কর।

শ্রীযুক্তা মণিমালা সেন (মণিদি)

———

মাধুকরী

বার্‌-ও মনে নেই, তারিখও মনে নেই। মনে গাঁথা আছে শুধু সেইটুকু। যা ধরা যায় না, ছোঁয়া যায় না, বোঝাও যায় না। যদি মা না কৃপা করেন। যা দেখে বা শুনে মন শুধু বিস্ময়ের নতুন নতুন স্তরে উঠে স্তব্ধ হয়ে থাকে। ভাষা-ভাব কোন গহন মনে লীন হয়ে থাকে—সে সময় থাকে না কোনও আমিত্ব তাই দশ-ইন্দ্রিয় হয় নীরব কর্ম্মী। যখন মন নিজের সত্ত্বা ফিরে পায় তখন মনে হয় নানারকম চিন্তার উদয়। তখন মনে হয় এ কে ডাকলাম না কেন? এ কথাটা ভালো করে শোনা গেল না তো? এইরকম আরও কত কি? অবশ্য আমার এইরকম হয় অন্যদের কি হয় জানি না। এই ধরণের একটা অভিজ্ঞতার কথা লিখতে ইচ্ছে করছে জানি না কতটা ফোটাতে পারবো।

আশ্রম জীবনের প্রথম বৎসর। রাত্রে প্রসাদ পাবার পরে শ্রীমা এসে শুয়েছেন খেলাঘরে। তখন দোতলা আরম্ভ হয় নি। আশীষালয়ে শুয়ে আছেন সাধুবাবা ও শান্তিভাই। আমি মা'র কাছে বসে আছি। হঠাৎ আশীষালয় থেকে শোনা গেল "আমি পারবো. "আমি পারবো।" শ্রীমা ডেকে বল্লেন—"কি হয়েছে শান্তি?" সাধুবাবা বল্লেন "শান্তিদার জ্বর-জ্বর লাগছে" (সেদিন কি কারণে মনে নেই সকলেরই জ্বর-জ্বর করছিল)। সেইজন্য বলছি যে যদি ভোরবেলা উঠতে না পারে তবে পূজা আমিও করতে পারবো।" শান্তিভাই তাড়াতাড়ি বলে উঠলেন "না মা আমিই পারবো। দিগেনদাকে বলছি যে যদি আমি না উঠি তো আমাকে ডেকে দেবে।" তখন কনু ও আমি বলে উঠলাম "আমি করবো, আমি পূজা করবো।" সকলের হৈ-হৈ'র মধ্যে শ্রীমা বল্লেন "পূজা আমিই করবো। তোমরা একটু দেরীতে উঠো। "আমরা আপত্তি করলাম কারণ শ্রীমারও জ্বর ছিল। তবু ঠিক হলো শ্রীমাই পূজা করবেন। তারপরে যে যার শুয়ে ঘুমোনো হলো।

পরদিন খুব ভোরে শ্রীমা উঠে স্নানে চলে গেলেন। আমার তো ওঠা বারণ কাজেই শুয়েই রইলাম। ঠিক যে কখন উঠবো তা বুঝতে পারছি না। সাধুবাবা আর শান্তিভাই খেলাঘর ও কচকচির মাঝখানের দরজার কাছে এসে বসলেন। দরজাটা বন্ধ ঠাকুরজী তখন কচকচিতে ছিলেন। ভিতরে চন্দন ঘষার আওয়াজ আর মাঝে মাঝে টিং টিং করে ঘণ্টা নাড়ার শব্দ হচ্ছে। আমার মনটা মোটেই স্বস্তি পাচ্ছে না। এইবার উঠে যাই, এইবার উঠে যাই ঘুরছে মাথার মধ্যে। অথচ বলে গেছেন 'এখন উঠো না, পরে উঠো'। 'পর'টা কখন তা আর স্থির করতে পারছি না। হঠাৎ মনে হলো শান্তিভাইকে জিজ্ঞাসা করি—যে উত্তর পাব সেটাই মনে করবো মার ইচ্ছা। জিজ্ঞাসা করলাম—"শান্তিভাই, এবার উঠে যাই ?" শান্তিভাই—"না, আর কিছুক্ষণ পরে উঠুন।" সুতরাং আবার শুয়ে পড়লাম। মিনিট ২।৩ পরেই ধড়মড় করে বিছানায় উঠে বসলাম। কি শব্দ শোনা যাচ্ছে না ঠাকুরঘর থেকে ? তিনজনে মুখ চাওয়া-চায়ি করলাম। হ্যাঁ। ঠিকই তো ! কন্নুকে কে ডেকে দেবে ? কন্নু যদি এসে পড়ে এখনই তো বেশ হয় ! না হলে যে বাদ পড়ে যাবে ? ঐ তো, আবার শব্দ হচ্ছে ! মনে হচ্ছে কে যেন খড়ম পায়ে কয়েক পা হাঁটলো। গরু চরানোর সময়ে রাখালেরা মুখে যে একরকম শব্দ করে সেইরকম শব্দ হচ্ছে।—গরুর খুরের শব্দ।—কি রকম যেন আওয়াজ, ঠিক বোঝা যাচ্ছে না কিসের। কয়েক রকম শব্দ হওয়ার মিনিট ৫।৭ পরে আরতির ঘণ্টা ও ঝাজ্ বাজতে লাগলো। বুঝলাম আরতি হচ্ছে। ঝাজ্ বাজা থেমে গেল। প্রণাম করলাম। উঠেই মনে হলো "তাই তো ? ঝাজ্ বাজালো কে ?" মনে পড়লো ঝাজ্টা তালে বাজে নি। "কে বাজালো ?" সাধুবাবা ও শান্তিভাই'র মুখের দিকে তাকালাম জিজ্ঞাসু মন দিয়ে। ওদের মুখেও বিস্ময়ের

ছাপ। খেয়াল হলো—তাই তো, কনু, লীলাদি এরা তো শুনতে পেলো না কিছু? দুঃখ হলো ওদের না শোনার জন্যেই লজ্জা হলো না-ডাকার জন্যে। কিন্তু তখন নড়বার মত মনের অবস্থা ছিল না। কাজেই স্বার্থপরের মত ওদের বাদ দিয়েই শুনলাম। মনে পড়ে সারাদিন বিবেকের দংশন সহ্য করেছি। আর একটা কথা মনে হয়েছে—ভাগ্যিস্ স্নানে যাই নি?

একটু বাদেই শ্রীমা বেরিয়ে এলেন পূজার ঘর থেকে। শ্রীমাকে প্রণাম করেই হৈ-হৈ এর ভিতর দিয়ে বলে ফেল্লাম যা শুনেছি। এক এক করে জিজ্ঞাসা করতে লাগলাম। শ্রীমা উত্তর দিতে লাগলেন যতটুকু মনে পড়ে লিখতে চেষ্টা করছি। শান্তিভাই জানালো যে খড়মের আওয়াজ তার কাছে কাঁঠিয়া-বাবার পায়ের মত লেগেছে। শ্রীমা হাসলেন কাজেই আমরা ধরে নিলাম কাঁঠিয়াবাবাই এসেছিলেন। গরু চরানোর শব্দের কথা বলতে শ্রীমা বল্লেন—"গোপাল আজ ভীষণ দুষ্টামী করেছে। নাড়ুর লোভ দেখানোতে শান্ত হয়েছে। মনে পড়লো মাঝখানে একবার গ্লাস ও থালার আওয়াজ পেয়ে মনে করেছিলাম ভোগ দিচ্ছেন। ঝাজ বাজিয়েছে কে জিজ্ঞাসা করাতে বল্লেন—"গোপাল বাজিয়েছিল। একটুও তালে বাজাতে পারে নি।" বলবার সময়ে শ্রীমার মুখে ফুটে উঠলো সস্নেহ-সুমধুর হাসি।

অচিন্ত্যনীয় ভাগ্যগুণে শ্রীমার নিত্যলীলার একটুখানি প্রকাশ পেয়ে নিজেদের ধন্য মনে হলো। কত সময় কতভাবে কত ক্ষুদ্র অলৌকিকত্বের প্রকাশ করে যাচ্ছেন, কিন্তু স্মরণশক্তি অভাবে তা ধরে রাখতে পারছি না—ভুলে যাচ্ছি। লেখনী শক্তির অভাবে লিখেও রাখতে পারি না মাগো, তুমি আমায় কত দিয়েছ, কত দিচ্ছ তাই প্রার্থনা করি কিছুই যেন নষ্ট না হয়॥

মিনতি দেবী

পরিশিষ্ট

এই পুস্তকের প্রথম প্রকাশক ছিল। আমার চতুর্থ পুত্র মণিলাল (অভিজিৎকুমার দত্তগুপ্ত)। ইং ১৯৪২ সনের ৮ই সেপ্টেম্বর তারিখে ২৪ বৎসর বয়ঃক্রম কালে তাহার ভবলীলা সাঙ্গ হয়। সে যেমন একদিকে চিররুগ্ন অন্যদিকে তেমনিই আধ্যাত্মিক ও মানসিক নানা গুণের অধিকারী ছিল এবং ইং ১৯৩৯ সনেই শ্রীশ্রীশোভা মা হইতে নাম প্রাপ্ত হয়। মায়ের প্রতি তাহার অসাধারণ ভক্তি ও ভালবাসা ছিল। মা এবং সুকুমারবাবুও তাহাকে অত্যন্ত স্নেহ করিতেন। তাহার পরলোক গমনের পর মা আমাকে যে পত্র লিখেন তাহার কিয়দংশ নিম্নে উদ্ধৃত হইল।

বরকান্তা
১২।৯।৪২ ইং

নারায়ণেষু—

* * * ভগবান্ তাহাকে তাঁহার পদতলে আশ্রয় দিয়াছেন তাই এত বড় দুঃখের মধ্যেও শান্তি পাইলাম। * * * তাহার অভাব স্থূলতঃ আমাকেও বড় ব্যথা দিয়াছে। যদিও স্থূলতঃ আজ আমার ছেলে আমার কোলে নাই, কিন্তু সূক্ষ্মতঃ আমার ছেলেকে আমার কোল হইতে কেহ ছিন্ন করিতে পারিবে না। সেখানে সে নিরবিচ্ছিন্ন ভাবেই আমার কোলেই থাকিবে।

যাক তাহার জন্য দুঃখ করিবেন না, তাহার উত্তম গতিই হইয়াছে। অনেকদিন হয়ত তাহার ব্যথা আপনারা ভুলিতে পারিবেন না, কিন্তু সে তাহার মায়ের কোলে আনন্দে আছে জানিয়া আপনারা সান্ত্বনা লাভ করিতে চেষ্টা করিবেন। মাসীমাকে সান্ত্বনা দিতে চেষ্টা করিবেন। অনেকদিন ত কলিকাতায় রাখিয়া তাহাকে সুস্থ বা রোগমুক্ত করা গেল না, কাজেই যেখানে গেলে সুস্থ বা রোগমুক্ত হওয়া যায় তাহার ছেলে সেখানেই গেছে। ছেলেকে সুস্থ করিবার জন্য মা ত ছেলেকে কত দূর দেশে পাঠায়। * * * ইতি শোভা।

এই সঙ্গে সুকুমারবাবু লিখেন—* * * একটা কথা আপনাদের এই দুঃখের মধ্যেও শান্তি দিতে পারে। শ্রীশ্রীমার নিকট হইতে জানিলাম মণিলালের জন্মমৃত্যুর দ্বার রুদ্ধ হইয়াছে। তাহাকে আর জন্ম গ্রহণ করিতে হইবে না।

অতঃপর শ্রীযুক্ত শিশিরবাবু মাকে জিজ্ঞাসা করিয়া আমাকে জানান—শোভা বলিলেন মণিলাল সত্যলোকে গিয়াছে। এরূপ গতি লোকের খুব কমই হয়।

মণিলাল জন্মমৃত্যুর অতীত হইয়াছে এ কথা পরেও মা বহুবার বহুলোককে বলিয়াছেন। ইহা প্রধানতঃ তাঁহারই কৃপার ফল তাহাতে সন্দেহ নাই। মণিলালের ন্যায় সদগতি লাভ করিতে পারেন ইহা বুঝিয়া আশা করি মায়ের অন্য সন্তানগণ যথেষ্ট আশ্বাস পাইবেন।

ওঁ মা

সন্তআশ্রম হইতে প্রকাশিত গ্রন্থাবলী

১।	শুভদা শোভা মা—শ্রীদাস	৩·০০
২।	বালিকা ব্রহ্মজ্ঞা শ্রীশ্রীশোভা মা (হিন্দী অনুবাদ) ডাঃ স্নুরেশ দেব ডি. এস. সি.	১·৫০
৩।	ঐ (উড়িয়া অনুবাদ) শ্রীযোগেন মহান্তি একজিকিউটিভ্ ইঞ্জিনীয়ার	১·৫০
৪।	হরিদ্বার পূর্ণকুম্ভে শ্রীশ্রীশোভা মা বীণা দেব বি. এ.	·৫০
৫।	শ্রীশ্রীশোভা মা বলেন শ্রীরামকৃষ্ণ গোপাল মুখোপাধ্যায়	·৫০
৬।	সন্তবাণী-ব্রহ্মচারী শিশিরকুমার	·৫০
৭।	বন্দনা (পূজাবিধি সংকলন) ব্রহ্মাচারিণী ইলাদেবী এম. এ.	·৭৫

প্রাপ্তিস্থান

শ্রীস্নুকমল রাহা
৮-নং, মতিলাল নেহরু রোড্
কলি-২৯

সন্ত-আশ্রম
সন্ত-নগর
লাক্সা, বারাণসী

রায় সাহেব শ্রীঅক্ষয় কুমার দত্তগুপ্ত, কবিরত্ন এম. এ.
লিখিত অন্য গ্রন্থ।—

যোগিরাজাধিরাজ

শ্রীশ্রীবিশুদ্ধানন্দ পরমহংস

—ঃ প্রাপ্তিস্থান ঃ—

শ্রীঅকিঞ্চন কুমার দত্তগুপ্ত

কৃপাকুঞ্জ

৬২নং, লেক এভিনিউ

কলি-২৬